আঁধার আখ্যান
কৌশিক মজুমদার

কৌশিক মজুমদার

Andhar Akhyan

by

Kaushik Majumdar

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২০

নামাঙ্কন ও প্রচ্ছদ : কামিল দাস

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

“গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন?”

অন্ধকার; জীবনানন্দ দাশ, বনলতা সেন।

কৃতজ্ঞতা

অরুন্ধতী মজুমদার, কামিল দাস,
রনিতা চট্টোপাধ্যায়, রাজর্ষি গুপ্ত, সায়ন কুমার দে,
সৌভিক চক্রবর্তী, তন্নিষ্ঠা মজুমদার

সূচিপত্র

নির্জন স্বাক্ষর

"তাহলে তো সব রহস্যই আপনি সমাধান করেছিলেন?"

"প্রায় সব। একটা বাদে। সেই নাট্য পরিচালক খুন। ওই একটিই অসম্ভব খুন দেখেছি লাইফে । অনেক ভেবেছি, রাতের পর রাত। খুনের কিনারা করতে পারিনি। আমার চাকরিজীবনের একমাত্র কালো দাগ। অমন হাই প্রোফাইল খুন সলভ করতে না পারার জন্য আমাকে দার্জিলিং বদলি করে দেওয়া হয়, জানো?

"আমি খুব অল্প শুনেছি কেসটার ব্যাপারে। আপনি যদি একটু খুলে বলেন..."

এক রবিবার সকালে কথা হচ্ছিল সুকল্যাণ মিত্রের সঙ্গে তুর্বসুর। তুর্বসু রায় পেশায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ। সবে কাজ শুরু করেছে। ওঁর ঠাকুরদার বাবা তারিণীচরণ ছিলেন কলকাতার প্রথম বাঙালি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। রে প্রাইভেট আই অ্যান্ড কোং নামে ক্লাইভ স্ট্রিটে অফিস খুলেছিলেন তিনি। এত বছর বাদে তুর্বসু সেই অফিসটাই সারিয়ে-টারিয়ে গোয়েন্দাগিরি করে। সুকল্যাণ মিত্র পুলিশের আই.জি পদে ছিলেন। চন্দননগরে একটা খুনের ব্যাপারে বাজেভাবে ফেঁসে গেছিল তুর্বসু। সুকল্যাণ না থাকলে তুর্বসু মারাও যেতে পারত। সেই থেকেই দুজনের আলাপ। কিছুদিন হল সুকল্যাণ রিটায়ার করেছেন। তুর্বসু সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে চলে আসে। উনি বিপত্নীক। ছেলে বিদেশে। ছেলের বয়সি তুর্বসুকে বেশ স্নেহের চোখেই দেখেন। নিজের চাকরিজীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেন।

"আসলে কেসটার কথা যত ভাবি, তত কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। অনেকবার অনেকভাবে ভেবেছি। কিন্তু এ যেন ম্যাজিক! তোমরা যাকে লকড রুম মিস্ট্রি বলো, ঠিক তাই। এখনও ভাবলে তাজ্জব লাগে..."

"আপনি শুরু থেকে বলুন।"

"খুনের মামলা তো, ও কোনও দিন তামাদি হয় না। তাই কিছু নাম ঠিকানা একটু গোপন রেখে বলছি। কিছু মনে কোরো না।"

"সে ঠিক আছে। আপনি বলুন।"

"নয়ের দশকের মাঝামাঝি হবে। আমি তখন লালবাজারে পোস্টিং। কদিন ধরেই খবর পেয়েছিলাম, কলকাতায় নাটক দেখাতে আসছেন বিখ্যাত নাট্যকার রঘুনাথ শর্মা। তখন তাঁর মতো সেলিব্রিটি পরিচালক আর দুটো নেই। ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার সদস্য, সারা বছর এ দেশ ও দেশ লেকচার দিয়ে বেড়ান, তাঁর এক-একটা নাটক নিয়ে পত্রপত্রিকায় গোটা পাতা জুড়ে রিভিউ ছাপা হয়, সে এক হইহই ব্যাপার আর কি! রঘু শর্মা তাঁর নতুন নাটক "তিতুমীর" নিয়ে আসছেন কলকাতায়। কলকাতার নানা মঞ্চে পনেরো দিন ধরে নাটকটা হবে। তারপর তিনি দমদম থেকেই রওনা দেবেন শিকাগোতে, কী এক লেকচার দিতে। যেহেতু সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই আমরা সবাই সতর্ক ছিলাম, তাঁদের কোনও অসুবিধা যাতে না হয়। গোটা দলকে রাখা হয়েছিল কলকাতার তখনকার সেরা হোটেলে। অ্যাকাডেমিতে প্রথম অভিনয় হল। ভিড় উপচে পড়েছিল।

পরের দিন সকালবেলায় নটা নাগাদ অফিসে ঢুকতে যাব, এমন সময় খবরটা পেলাম। রঘুনাথ শর্মা একটু আগেই হোটেলে খুন হয়েছেন।"

"সেদিন সকালেই?"

"হ্যাঁ, আর সেই কেসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে! কী কুক্ষণে যে কেসটা হাতে নিয়েছিলাম!"

"যাই হোক, তারপর?"

"রাস্তায় যেতে যেতে কেস ফাইলে চোখ বোলালাম। পনেরো মিনিট আগে লালবাজারে হোটেল থেকে ফোন করে জানানো হয়েছে। যিনি জানিয়েছেন তাঁর নাম সুধীর বসু। মজার ব্যাপার, শুধু নামই না, তিনি নিজের পেশাও জানিয়েছেন। প্রাইভেট ডিটেকটিভ, এই অনেকটা তোমার মতো। কিন্তু তিনি ওখানে কী করছিলেন? ভাবতে ভাবতে হোটেলে পৌঁছে দেখি সবার মুখে কেমন ভয় ভয় ভাব। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম রিসেপশনটা কোথায়? কোনওক্রমে আঙুল দিয়ে দেখাল। রিসেপশনে একটা সুন্দরী মেয়ে বসে ছিল। কিন্তু চোখে মুখে আতঙ্ক। আমাকে দেখে একটু যেন আশ্বস্ত হল। আমি কিছু বলার আগেই সোজা সামনে দেখিয়ে দিল। আর তখনই আমি দেখতে পেলাম।"

"কী দেখলেন?"

"হোটেলে গ্রাউন্ড ফ্লোরের লাউঞ্জে তিনটে লিফট আছে। দুটো বন্ধ। আর একটা হাঁ করে খোলা। যেটা খোলা সেটায় কিছু একটা মাটিতে পড়ে আছে। প্রথমে ভাবলাম সাদা পুঁটুলি জাতীয় কিছু। পরে দেখলাম একটা মানুষ। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার পিঠ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। দুই হাত দুইদিকে ছড়ানো। অসহায় ভাবে লিফটের মধ্যে খুন হয়ে পড়ে আছেন বিশ্ববরেণ্য পরিচালক রঘুনাথ শর্মা। সামনে গিয়ে দেখলাম ডান হাতের কাঁধের কাছেও রক্তের দাগ। কিন্তু যে অস্ত্র দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে সেটার কোনও চিহ্ন নেই। আজ অবধি পাওয়া যায়নি।"

"জেরা করে কী জানা গেল?"

"যা জানা গেল, তাতেই তো মাথা ঘুরে গেল হে! রঘুনাথ শর্মা বেশিরভাগ সময় বিদেশে থাকতেন। দেশে থাকলেও দিল্লির আনন্দ বিহারের বাড়িতে। কিন্তু ওঁর স্ত্রী মধুরা বাঙালি। তিনি আবার ভালো অভিনেত্রীও বটে। রঘুর সব নাটকে লিড রোলে থাকেন। মধুরা ইদানীং বাংলা ছবিতে ট্রাই নিচ্ছিলেন। সেটা মন্দ না। মধুরার তখন বয়স অল্প, দেখতে শুনতে ভালো..."

"কিন্তু যা জানি রঘুনাথ শর্মা তো প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সি ছিলেন।"

"ঠিকই জানো। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা! বুড়ো বয়সে নিজের ছাত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, কলকাতায় আসার পর গোটা নাটকের দলকে সরকার থেকে কলকাতার সেরা ফাইভ স্টার হোটেলে রাখা হল। খুনের দিন রঘুনাথ বেশ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েন। এই সাতটা নাগাদ। মধুরাও তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। তাঁকেও তিনি জাগিয়ে দেন। বলেন আটটায় তাঁকে একবার তৈরি হয়ে নিচে যেতে হবে। মধুরা জিজ্ঞাসা করেন, কী এমন দরকার, যার জন্য দশটায় ওঠা মানুষ সাতটায় উঠে পড়ল। রঘু নাকি জবাব দেন, একজন নিচে দেখা করতে আসবে। কে সে প্রশ্ন করাতে অদ্ভুত জবাব দেন। বলেন, এ হল সেই লোক যার কাছে সেই উত্তরটা আছে, যেটা রঘু অনেকদিন হল খুঁজছেন।"

“এর মানে কী?”

“প্রথমে আমিও বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম। বলছি ধীরেসুস্থে। শুনে যাও। এই জায়গাটা খুব ইম্পরট্যান্ট। ঠিক আটটায় সাদা ফুলহাতা জামা আর সাদা প্যান্ট পরে রঘুনাথ ঘর থেকে বেশ তাড়াহুড়ো করেই বেরোলেন। তাঁদের ঘর ছয়তলায়। লিফটের কাছে গিয়েই তাঁর মনে পড়ল তিনি তাড়াহুড়োতে হাতঘড়ি ঘরে ফেলে এসেছেন। দরজার সামনে গিয়ে তিনি স্ত্রীকে ডাকলেন। স্ত্রী ঘড়ি নিয়ে বেরিয়ে এসে তাঁকে লিফট অবধি এগিয়ে দিলেন। রঘুনাথ লিফটে ঢুকেই সোজা নিচে নামার বোতামটা টিপলেন, যাতে লিফট মাঝে আর কোথাও দাঁড়াবে না। এমনকি সওয়ারি চাইলেও না। তখন বাজে ঠিক আটটা তিন।”

“দাঁড়ান, দাঁড়ান। দুটো প্রশ্ন। এক, সময়টা এত নির্ভুল জানা গেল কীভাবে? আর দুই, এটা তো মধুরার ভার্সান। মিথ্যেও তো হতে পারে!”

“দুটোর জবাবই দিচ্ছি। রঘুকে মধুরা ঘড়ি দেবার সময় রঘু জিজ্ঞেস করেন, দ্যাখো তো ঘড়ি চলছে কি না, তখনই মধুরা সময়টা দেখেন। রঘু চাবি দেওয়া টিসট হাতঘড়ি ব্যবহার করতেন, আর মাঝে মাঝেই চাবি দিতে ভুলে যেতেন, তাই প্রশ্নটা অস্বাভাবিক না। আর দ্বিতীয়টার সাক্ষী আছে। হোটেলের এক সাফাইকর্মী লিফটের ভিতর সাফ করছিল। সে বেরোতেই রঘু ঢুকে সোজা গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতাম টেপেন।”

“কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন রঘুনাথ?”

“হ্যাঁ, এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে। যিনি নিজে হোটেল থেকে পুলিশে ফোন করেন।”

“সুধীর বসু?”

“হ্যাঁ, সেই সুধীর বসু। মাস ছয়েক আগে রঘুনাথ নাকি একবার কাউকে না জানিয়ে কলকাতায় আসেন। তখনই তিনি সুধীরবাবুকে অ্যাপয়েন্ট করেন মধুরাকে ফলো করার জন্য। তাঁর ধারণা ছিল মধুরা তাঁরই দলের লিড অ্যাক্টর প্রিয়াংশু সিনহার সঙ্গে তুমুল প্রেম চালাচ্ছেন। দুজনেই বাঙালি। প্রিয়াংশুও টলিউডে চেষ্টা চালাচ্ছে, তাই সন্দেহ অমূলক নয়। আর মধুরাও একেবারে সতী টাইপের মেয়ে না। পুরুষ দেখলেই ওঁর ছোঁকছোঁক বাড়ত।”

“সুধীর বসু সেই তদন্ত চালান?”

“হ্যাঁ, কিন্তু তদন্তের ফল রঘুকে জানাতে পারেননি। জানানোর কথা ছিল সেদিন। সাক্ষাতে। আগের দিন বিকালে দল নিয়ে নাটকে যাবার আগে হোটেলের ফোন থেকে রঘু মিনিট দু-এক সুধীরবাবুর সঙ্গে কথা বলেন। সুধীরবাবু পুলিশকে জানিয়েছিলেন, সেই ফোনে রঘুনাথ ঠিক আটটায় সুধীরবাবুকে গ্রাউন্ড ফ্লোরের লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে বলেন। এক মিনিট আগেও না। এক মিনিট পরেও না। শুধু তাই না, এটাও বলেন, এর অন্যথা করলে সুধীরবাবু একটা পয়সাও পাবেন না।”

“ওঁর অদ্ভুত লাগেনি? এরকম নির্দেশ?”

“অবশ্যই লেগেছিল। কিন্তু উনি ছাপোষা গোয়েন্দা। খদ্দেরও খুব বেশি নেই, টাকার দরকার। উনিও কথা না বাড়িয়ে মেনে নেন। ওদিন হোটেলের সামনে সাতটা পঞ্চাশ নাগাদ পৌঁছে গেছিলেন। কিন্তু দশ মিনিট অপেক্ষা করে ঠিক আটটায় লাউঞ্জে এসে বসেন। আর বসার মিনিট চারেকের মধ্যে লিফট নেমে আসে। সঙ্গে রঘুর মৃতদেহ।”

“আটটা তিনে রঘু ছয়তলায় লিফটে চাপেন। আটটা চারে লিফট নিচে নেমে আসে। এতক্ষণ লাগল ছয়তলা থেকে নামতে?”

"খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। আসলে রঘু শুরু থেকেই দাবি করেছিলেন তাঁদের নাটকের মালপত্র ইত্যাদি নেবার জন্য আর তাঁর দলের লোকদের ওঠা নামার জন্য একটা লিফট ছেড়ে দিতে হবে। তাতে অন্য কেউ গেলে হবে না। যেহেতু সেলিব্রিটি মানুষ, হোটেল মেনে নেয়। তবে তাদের মালপত্র বা গুডস লিফটের একটা বেশ আস্তে নামে। সেটাই রঘুর দলকে দিয়েছিল ওরা। আমি নিজে চড়ে দেখেছি। পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড লাগে।"

"মানে হাতে রইল পনেরো সেকেন্ড।"

"তাও রইল কি না সন্দেহ। কারণ রঘুর ঘড়ি আর সুধীরবাবুর ঘড়িতে পনেরো সেকেন্ডের তফাত হতেই পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা লিফটে ঢুকে রঘু সোজা নিচে যাবার বোতাম টিপেছিল। ও নিজে চাইলেও নিচে নামার আগে লিফট থামাতে পারত না। লিফটের ভিতরে কেউ ছিল না, সেটা মধুরা, সেই সাফাইকর্মী আর সুধীরবাবু সবাই বলেছেন।"

"অন্য ফ্লোরের কেউ বাইরে থেকে বোতাম টিপে থামাতে..."

"প্রশ্নই ওঠে না, ওভাবে করা যায় না ডাইরেক্ট বোতামে।"

"আচ্ছা যদি কেউ আগে থেকেই লিফটের ওপরে উঠে বসে থাকে? লিফট চলা শুরু হতেই নেমে এল। খুন করল। তারপর আবার উপরে চড়ে বসল। তাহলে তো যে কেউ ভাববে লিফট খালি..."

"তুর্বসু, এটা আমার মাথায় আসেনি ভেবেছ? আমি প্রথমেই সেটা ভেবেছিলাম। কিন্তু সে গুড়ে বালি। লিফটের কামরার ওপরে একটা জালি লাগানো আছে বটে, কিন্তু সেটা শত চেষ্টাতেও ওপর থেকে খোলা যাবে না। খুলতে হলে ভিতর থেকে খুলতে হবে। আমি তাও চেক করেছি। স্ক্রুতে জং পড়ে গেছে। বহু বছর কেউ ওতে হাত দেয়নি।"

"রঘুর দেহে কোথায় কোথায় ক্ষত ছিল?"

"ডান হাতে দুটো ক্ষত। তবে ডিপ না। মেজরটা ছিল পিঠে। একটা ছুরি বা ভোজালি সোজা কেউ পিঠে গেঁথে দিয়েছিল। গোটা জামাকাপড় লন্ডভন্ড। যেন কারও সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছে।

"আর ছুরিটা?"

"সবার ঘর সার্চ করেও সেটা পাওয়া যায়নি।"

"সবার মানে?"

"মধুরা, প্রিয়াংশু আর নাটকের যারা সেসময় হোটেলেই ছিল, তাদের।"

"সবাই একই ফ্লোরে ছিল?"

"না। টপ ফ্লোরে রঘু আর মধুরা, তার ঠিক নিচের ফ্লোরে প্রিয়াংশু আর সেকেন্ড ফ্লোরে বাকিরা সবাই।"

"প্রিয়াংশু আলাদা কেন?"

"ওভাবেই বুকিং হয়েছিল। এতে ওর কোনও হাত নেই।"

"ওর জবানবন্দি নিয়েছিলেন?"

"অবশ্যই। ও দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। আমরা গিয়ে ওর ঘুম ভাঙাই।"

“ও-ই তো মধুরার সঙ্গে প্রেম করত?”

“এখানে একটা প্যাঁচ আছে। সেটাই তোমাকে বলা হয়নি। সুধীরবাবু মধুরাকে আর প্রিয়াংশুকে ফলো করে নিশ্চিত হন ওঁদের মধ্যে প্রেম কেন, বন্ধুতা ছাড়া কিছুই নেই। বরং মধুরা অন্য একজনের প্রেমে হাবুডুবু। কলকাতায় সে এলে দুজনে এক হোটেলে রাত কাটায়।”

“কে সে?”

“রঘুনাথের ম্যানেজার সূরজ প্রতাপ সিং, পাঞ্জাবি ছেলে।”

“বলেন কী? সাসপেক্ট তো তাহলে পরিষ্কার। সূরজকে জেরা করলেন?”

“নাহ্।” মাথা নেড়ে বললেন সুকল্যাণ মিত্র।

“কেন?”

“কারণ সূরজ তখন কলকাতাতেই ছিল না। ইন ফ্যাক্ট দেশেই না। রঘুই ওকে শিকাগোতে পাঠিয়েছিলেন ওখানকার ব্যবস্থাপাতি দেখাশোনা করতে। রঘু গেলে ও চলে আসত।”

“মানে সূরজ তো সন্দেহের বাইরে চলে গেল, যদি না ও কাউকে দিয়ে করায়।”

“তুমি বুঝতে পারছ না তুর্বসু, প্রশ্নটা কে না, প্রশ্নটা কীভাবে? চলন্ত লিফটে এক মিনিটের কম সময়ে আততায়ী ঢুকল কেমন করে, আর বেরিয়েই বা গেল কী ভাবে? আর সেই রিভলভার? সেটাও কী করে রঘুর পকেটে এল?”

“কোন রিভলভার?”

“এ বাবা! এত কথা হল, আর ওটার কথা বলিনি! ওটা একটা পুরোনো কোল্ট ০.৩২। এককালে নাকি রঘুরই ছিল। মধুরা বিয়ের শুরু শুরুতে দেখেছিল। তারপর মাস ছয়েক আগে কোনওভাবে ওটা হারিয়ে যায়। মৃত রঘুর পকেটে যখন ওটা পাওয়া যায় তখন কিন্তু একেবারে চকচক করছে। সাইলেন্সার লাগানো। সবকটা বুলেট ভরা।”

“ওটাই যে হারানো বন্দুক কী করে নিশ্চিত হলেন?”

“বাঁটে রঘুর নাম খোদাই করা ছিল। দলের অনেকেও চিনেছে ওটা।”

“হারানোর পর রঘু এফআইআর করেননি?”

“নাহ। অন্তত সেরকম কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।”

“হুম। একটাই প্রশ্ন। নাটকের প্রপস, মানে যেখানে সব সাজসরঞ্জাম রাখে সেই রুমটা কোন তলায় ছিল? আর তার চাবি কার কাছে ছিল?”

“পাঁচতলায়। লিফটের উলটো দিকে প্রিয়াংশুর রুম, তার পাশেরটাই প্রপস রুম। চাবি দুটো ছিল। একটা রঘুর কাছে, একটা প্রিয়াংশুর কাছে, যেহেতু ও ওই ফ্লোরেই ছিল।”

“বুঝলাম। আর একটা কথা, ওই দুটো রুমের পরে কি কোনও টার্ন বা বাঁক ছিল?”

“আশ্চর্য! তুমি জানলে কীভাবে? ওই দুটো ঘর বাকি লবি থেকে একেবারে আলাদা ছিল। লবির শেষের একটা বাঁক, তারপর ওই দুটো ঘর।”

“তার মানে লবিতে লোক চলাচল করলেও ওই দুটো ঘরকে দেখা যাবে না, ঠিক কি না?

"একেবারে ঠিক।"

"যাক, এতক্ষণে ধোঁয়াশা কাটল।"

"তাই নাকি? কী বুঝলে বলো দেখি? বুঝলে খুনি কে?"

"বোধহয় বুঝতে পেরেছি।"

এবার সত্যি সত্যি চমকে উঠলেন রিটায়ার্ড আইজি সুকল্যাণ মিত্র। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন,

"তাই নাকি? খুনি কে? নাকি কারা?"

"খুনি একজনই। রঘুনাথ শর্মা।"

ঘরে পিন পড়লেও বুঝি শব্দ শোনা যায়। খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সুকল্যাণ, "তুমি কি ফাজলামো মারছ নাকি হে? এত কথা শোনালাম তোমার ইয়ার্কির জন্য?"

তুর্বসু খুব বিনীতভাবে বলল, "মাপ করবেন। রেগে যাবেন না। এত বছর বাদে সেভাবে কিছু প্রমাণ করা মুশকিল। কিন্তু আপনি যাকে অসম্ভব খুন বলছেন, আমার কাছে তার ব্যাখ্যা আছে। রঘু তাঁর হারানো বন্দুকের এফআইআর কেন করলেন না? সে বন্দুক তাঁর পকেটে এল কীভাবে? চলন্ত লিফটে কীভাবে তাঁর দেহ পাওয়া গেল? কেনই বা তিনি সুধীরবাবুকে ঠিক আটটায় আসতে বলেছিলেন, আগেও না পরেও না, সব কিছুর। একমাত্র একটা গল্পেই এই সবকটা পাজল মিলে যায়। একেবারে খাপে খাপ, পঞ্চুর বাপ।"

"কীভাবে, বলো শুনি।"

"অনেকদিন ধরেই মধুরা আর প্রিয়াংশুর বন্ধুতা দেখে রঘুর চোখ টাটাচ্ছিল। ওঁরাও হয়তো একটু বেশিই স্বাধীনভাবে মিশতেন, কারণ ওঁরা জানতেন ওঁরা কোনও পাপ করছেন না। মধুরার প্রেমের কিছু প্রমাণ হয়তো রঘু পেয়েছিলেন, কিন্তু উনি তো আগে থেকেই প্রিয়াংশুকে অপরাধী বানিয়ে বসে আছেন। সূরজের কথা তাঁর মাথাতেই এল না। একসময় তিনি ঠিক করলেন প্রিয়াংশু বাঁচার অধিকার হারিয়েছে। ওকে খুন করতে হবে। কীভাবে? গুলি করে। তাই প্রথমেই প্রচার করে দিলেন তাঁর বন্দুক খোয়া গেছে। কিন্তু তার জন্যে যে এফআইআর করতে হয়, সেটা করলেন না। তাহলে তো সব ধরা পড়ে যাবে! এবার তাঁর দরকার ছিল একজন সাক্ষী। যে তাঁর হয়ে পুলিশকে সাক্ষ্য দেবে। আর পুলিশও তার কথা বিশ্বাস করবে। তিনি সুধীরবাবুকে অ্যাপয়েন্ট করলেন। মনে রাখবেন, রঘু আগেই নিশ্চিত ছিলেন মধুরা প্রিয়াংশুর সঙ্গেই প্রেম করছেন। তাই এই তদন্ত নেহাত ধোঁকার টাটি ছাড়া কিছু না। আগেই উত্তর জেনে এক্সপেরিমেন্ট করার মতো। শুধু বুঝতে পারেননি, এক্ষেত্রে ওঁর ভাবনাটা ভুল। যাই হোক, উনি খুনের প্লট সাজালেন। যাকে বলে পারফেক্ট মার্ডার। আর সেইজন্যেই ঠিক আটটার সময় সুধীরবাবুকে লাউঞ্জে আসতে বললেন। আগেও না। পরেও না।"

"বুঝলাম না, বুঝলাম না। এক মিনিটের কম সময়ে খুন করবেই বা কী করে? তাও চলন্ত লিফট থেকে? ও তো চাইলেও বেরোতে পারবে না?"

"এখানেই এই পারফেক্ট প্ল্যানের তুরুপের তাস। রঘু ঘর থেকে আটটা তিনে বেরিয়েছেন। এটা কীভাবে জানা গেল?"

“মধুরা বলেছেন।”

“মধুরা কীভাবে জানলেন?”

“রঘুর ঘড়ি দেখে।”

“ঘড়ি দেখতে কে বলেছিল?”

“রঘু... মানে...”

“একদমই তাই। রঘু যে আটটা তিনে লিফটে চাপলেন, সেটার সাক্ষী দরকার ছিল। আর তার জন্যেই তিনি ঘড়ি ঘরে ফেলে আসেন। এবার ধরুন ঘড়ির সময় যদি দশ মিনিট এগোনো থাকে? মানে রঘু রওনা হচ্ছেন সাতটা পঞ্চাশে, কিন্তু মধুরা ভাবছেন রঘু আটটা তিনে বেরোচ্ছেন। আগের দিন শো ছিল, শুতে রাত হয়েছে। মধুরাও ঘুম চোখে আর সময় রিচেক করেননি, বা করলেও সেটাকে দরকারি কিছু ভাবেননি। দশ মিনিট কী আর এমন টাইম।

রঘু সোজা নিচের বোতাম টিপে সাতটা একান্নতে নিচে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার পাঁচতলার বোতাম টিপে চলে গেলেন পাঁচতলায়। এই ফাঁকে ঘড়ির টাইম ঠিক করে নিলেন। তিনি আগে থেকেই জানতেন এই লিফটে দলের কেউ ছাড়া অন্য লোক আসবে না। সেইজন্যেই শুরুতে একটা লিফট নিজেদের জন্যে করে নেন। একা প্রিয়াংশুর রুম পাঁচতলায় বুক করার পিছনে প্রিয়াংশুর হাত নেই ঠিক, কিন্তু রঘুর হাত ছিল। তিনি চাননি দলের কেউ তাঁকে দেখে ফেলুক। ঠিক সেইজন্যেই লিফটের ঠিক উলটো দিকে প্রিয়াংশুর রুম। যাতে লিফট থেকে বেরিয়ে লবিতে হাঁটতে না হয়। বন্দুকে সাইলেন্সার লাগানোতে এটাও পরিষ্কার যে নিঃশব্দে খুনটা সেরে ফেলতে চাইছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন প্রিয়াংশুর রুমে যাবেন। এক গুলিতে তাকে খুন করবেন। সত্যিকারের আটটা তিন নাগাদ লিফটে উঠে সোজা পাঁচতলা থেকে নিচে নেমে আসবেন, লাউঞ্জে বসে থাকা সুধীরবাবু সাক্ষ্য দেবেন তিনি আটটা চারে নেমে এসেছেন। আপনি যেটা বললেন, আটটা তিনে লিফটে উঠে চাইলেও উনি কীভাবে খুন করে আটটা চারে নামতে পারেন? একেবারে ওয়াটার টাইট অ্যালিবাই। আর তারপরেও যদি বন্দুক ইত্যাদি থেকে ওঁর খোঁজ পড়ে, উনি তখন ধরাছোঁয়ার বাইরে শিকাগোতে। কিন্তু মুশকিল একটা হল...”

“কী মুশকিল?” সুকল্যাণ মিত্রর মুখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে।

“একটা জিনিস হিসেবের মধ্যে আনেননি রঘু। তাঁর বয়স পঞ্চাশ, আর প্রিয়াংশু তাগড়াই তিরিশ-না-পেরোনো ছোকরা। ফলে বন্দুক তুলে গুলি করার আগেই হাতাহাতি শুরু হল। খুব সম্ভব বন্দুক ছিটকে যায়। রঘু প্রিয়াংশুর ওপরে চেপে বসেন। প্রিয়াংশুর হাতের সামনে ছুরি জাতীয় কিছু ছিল। রঘুকে সরাতে সে তাঁর হাতে দুবার আঘাত করে। শেষে আর না পেরে গোটা ছুরি ঢুকিয়ে দেয় রঘুর পিঠে। রঘু সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। এবার চেপে বসে ভয়। সে ছুরি তুলে নেয়। ভাবতে থাকে মৃতদেহ কোথায় ফেলবে। তার তখন মাথা কাজ করছে না। এদিকে এসব করতে গিয়ে দশ মিনিট কেটে গেছে। সে কোনওমতে দেহটা নিয়ে ঘরের উলটোদিকে লিফটে চড়িয়ে দেয়। দিয়েই ডাইরেক্ট নিচের বোতাম টিপে দেয়। কাকতালীয় ভাবে তখন ঠিক আটটা তিনই বাজে। রঘু তাঁর প্ল্যান মতোই নিচে নেমে যান। ভুল বললাম, রঘু না, রঘুর মৃতদেহ...”

“তাহলে সেই ছুরি?”

"একটা বালির কণা লুকিয়ে রাখার সবচেয়ে ভালো জায়গা কোনটা জানেন? বালির স্তূপ। সেখানে অনেক বালির মধ্যে একটা বালি ধরা পড়ে না। তাই আমি প্রপস রুমটা কোথায় জানতে চাইলাম। রঘুকে মেরে ছুরিটা ধুয়ে মুছে প্রিয়াংশু প্রপস রুমে রেখে দেয়। মনে রাখবেন নাটকটা তিতুমীর, সেখানে ছুরি, তির, ধারালো অস্ত্র প্রপস হিসেবে ব্যবহার হয়। তাই ওই রুমটা দেখলেও তার মধ্যে আলাদা করে একটা ছুরি চোখে পড়বে না। কিন্তু আপনারা কি ওই রুমটা দেখেছিলেন?"

পাশাপাশি মাথা নাড়লেন সুকল্যাণ মিত্র। দেখেননি। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। চোখ ছলছল। "কী লজ্জা তুর্বসু, তোমায় কী করে বোঝাই? ডিপার্টমেন্টে আমার সব সুনাম এই একটা কেসে শেষ হয়ে গেছিল। আমার আড়ালে অনেকেই আমায় রঘু রঘু বলে ডাকত, জানো। তোমার সঙ্গে আগে কেন দেখা হল না বলো তো..." বলতে বলতে হঠাৎ কী যেন মনে হল তাঁর, "আচ্ছা তুর্বসু, মার্ডার কেস তো তামাদি হয় না। বলে কয়ে কেসটা রি-ওপেন করাব?"

তুর্বসু মাথা নিচু করে বসেছিল, বলল, "স্যার, জয় বাবা ফেলুনাথ দেখেছেন? অম্বিকা ঘোষালের একটা কথা আছে, যার মনে চুরি, সে-ই তো চোর! এখানে তাই খুনি একজনই। রঘুনাথ শর্মা। আর সে তো তার পাপের শাস্তি পেয়েইছে। আপনি নাম বলেননি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি প্রিয়াংশু কে। সে এখন টলিউডের সেরা অভিনেতাদের একজন। মধুরাও সূরজকে বিয়ে করে সুখেই আছে। পেজ থ্রি-তে ছবি-টবি দেখি। কী দরকার স্যার নির্দোষ এতগুলো মানুষকে কষ্ট দেবার? রঘু চেয়েছিল প্রিয়াংশুর মৃত্যুদূত হতে। বুঝতেই পারেনি মৃত্যু কোন ফাঁকে এসে ওর পিঠে নিজের নির্জন স্বাক্ষর রেখে গেছে।"

লেখকের জবানি : ক্লাসিক্যাল লকড রুম মিস্ট্রি যাকে বলে, তার জনক ছিলেন জন ডিকশন কার। লকড রুম মিস্ট্রি কতরকম হতে পারে তার প্রতিটার সংজ্ঞা তিনি তাঁর বিখ্যাত থ্রি কফিনস বইতে দিয়েছেন। পৃথিবীর কোনও লেখকের সাধ্য হয়নি তাঁর বাইরে বেরোনোর, আমি তো কোন ছাড়। কিন্তু বহুদিন বাংলায় কোনও ক্লাসিক লকড ডাউন মার্ডার দেখি না। তাই নিজেই লিখতে বসলাম, সেই ছোট্টবেলায় হলদে হয়ে আসা বইগুলোতে যে ধরনের গল্প পড়তাম, তার আদলে.... এই কাহিনি সূর্যতামসীর স্পিন অফ। ঘটনাক্রমানুযায়ী সূর্যতামসীর পরে হলেও আসলে প্রকাশিত হয়েছিল (চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম সাইটে) বই প্রকাশের একমাস আগে (মে, ২০২০)। তাই পাঠকের কাছে তুর্বসুর আবির্ভাব কাহিনি এক অর্থে এটাই।

স্ন্যাপচ্যাট

ডাকবাক্সটায় ধুলো পড়েছে অনেকদিন হল। আজকাল আর খোলাই হয় না। তবু সেদিন অফিস ফেরতা কী একটা উঁকি মারতে দেখে বাক্সের জং ধরা ছিটকানিটা খুলেই ফেলল অর্ণব। আর খুলতেই চিঠিটা বেরিয়ে এল। গোলাপি খামের চিঠি। উপরে লাল লাল গোলাপের ছবি আঁকা। এককালে আর্চিস কোম্পানি এইরকম খাম বেচত। এই খামে কে চিঠি দেবে ওকে? উপরে ওর নাম ঠিকানা লেখা। হাতে নিয়ে বুঝল ওজনদার বেশ।

সুজাতা লিখেছে? কিন্তু ওপরের হাতের লেখা সুজাতার না। আর যাবার আগে সুজাতা যা লিখে গেছিল, তাতে ও আবার ফিরে আসবে, সে সম্ভাবনা কম। কে জানে কোথায়, কার সঙ্গে, কী নাম ভাঁড়িয়ে নতুন সংসার পেতেছে! শুধু যাবার আগে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেছে অর্ণবকে।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পাখা চালিয়ে দিল অর্ণব। সারাদিনের জমাট গরম হাওয়া নেমে আসছে নিচে। মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপে প্রায় গোটা পঞ্চাশ মেসেজ। সেদিনের প্রেস কনফারেন্সটার পর প্রচুর লোকে জানতে চাইছে। হতে পারে উদ্বেগ। তবে গসিপটাই আসল বোধহয়। অর্ণবের কপাল বেয়ে দরদর করে ঘামের ফোঁটা নামতে থাকে। জামা প্যান্ট খুলে বারমুডা পরে খাটের ওপর বসে চিঠিটা খুলল সে। জেরক্সের সস্তা সাদা এ-ফোর পাতায় ডটপেনে লেখা চিঠি। বেশ কয়েকপাতা জোড়া। হাতের লেখা দেখে বোঝাই যাচ্ছে খামের ঠিকানাটাও এই হাতেই লেখা। চিঠিটা এইরকম—

মাননীয় শ্রী অর্ণব দাশগুপ্ত,

হরিপুর, অশোকনগর।

পিন— ৭৪৩২২২

"মাননীয় অর্ণববাবু,

আপনি আমাকে চিনবেন না। আর এখন যা পরিস্থিতি, তাতে আমার নিজের নাম বলাও সমীচীন বোধ করছি না। আপনি পুলিশকে আমার নাম বলে দেবেন। আমার পুলিশে বড্ড ভয়। এই চিঠি আমি হয়তো কোনও দিনও লিখতাম না। কিন্তু সেদিন স্টার আনন্দে আপনাকে দেখলাম। আপনার সাক্ষাৎকার দেখলাম। সাংবাদিকের সামনে অবলীলায় আপনি আমায় চোর বলে দিলেন মশাই! এতদিন তো বেশ চুপচাপ ছিলেন। আজ কার অনুপ্রেরণায় আপনি খামখা এতগুলো সাংবাদিকের সামনে, দেশের সামনে আমাকে মিথ্যে অপবাদ দিলেন? আমি চোর না অর্ণববাবু। আমি আবার বলছি, আমি চোর না। জানি সুজাতা আপনার জমানো সব টাকা নিয়ে ছয় মাস আগে আমার সঙ্গে পালিয়েছিল। আপনার পকেট এখন প্রায় গড়ের মাঠ। কিন্তু সেজন্য আমি দায়ী নই। আসল ঘটনা না জেনে জনসমক্ষে আমাকে চোর বললে তো আমায় প্রতিবাদ করতেই হবে। আপনার জানা উচিত ঠিক কী ঘটনা ঘটেছিল।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, যে আপনার স্ত্রী অতি মুখরা একটি মহিলা। সারাদিন বকবক বকবক করেই যাচ্ছে। কোনও কিছুতেই ক্ষান্তি নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন, ওর এই কথা শুনেই ওর প্রেমে পড়েছিলাম। আসলে পরের বউ হলে যা হয় আর কি! আর দেখতে শুনতেও... বলতে কী নিতান্ত মন্দ নয় আপনার স্ত্রী। বছর দেড়েক আগের কথা। তখন সদ্য সদ্য সুকন্যার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শেষ হয়েছে। আমি বুঝে গেছিলাম ও আর কোনও দিন আমার জীবনে ফিরে আসবে না। তাই সঙ্গী খুঁজতে স্ন্যাপচ্যাটে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম। বেকার ছেলে। ফ্রি জিও। দেখতে শুনতে মন্দ নই। একদিন আচমকা একটা রিকোয়েস্ট এল। সুইট সুজি। তখনও আমি ভাবতাম, ওখানে যেসব মহিলার রিকোয়েস্ট আসে, তারা সব ফেক আইডি। এটাও সেরকমই কিছু একটা। প্রথমদিকে পাত্তা দিইনি জানেন। কিন্তু আপনি তো সুজাতাকে চেনেন। যদি একবার কোনও কিছু মাথায় ঢোকে, তবে সেটা পেয়েই ছাড়বে। প্রথমে বিরক্ত হতাম। তারপর ভালো লাগতে শুরু করল। দিনে চার ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা টানা কথা হত। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলি, এর জন্য ওকে পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। আপনার অফিসের যা চাপ! আপনি সময় দিতেন না বলেই বেচারি স্ন্যাপচ্যাটে অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। প্রথম প্রথম টাইপ করে চ্যাট, তারপর ভয়েস চ্যাট। সেখানে ওর গলা শুনে প্রথমবারই প্রেমে পড়েছিলাম, জানেন। কী মিষ্টি গলা, আর কী দারুণ কথা বলতে পারে! দারুণ গানও জানে। অনেক রাতে আপনি যখন ওর পাশে ঘুমিয়ে পড়েছেন, ও তখন ফিসফিস করে আমায় গান শোনাত। আমার খুড়তুতো দিদির মতো। দিদি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো ছিল। আমরা রাতে একসঙ্গে শুতাম। আমার যখন তেরো, একদিন রাতে দেখি ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছে। দিদি আমার মুখটা নিয়ে চেপে ধরেছে ওর নরম বুকে। ও বুকে "রোজ সেন্ট" মাখত। তার সঙ্গে ঘামের গন্ধ মিশে অদ্ভুত এক গন্ধ আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তারপর কী হয়েছিল ঠিক মনে নেই। কদিন বাদে কেমন করে যেন কাকিমা জেনে গেছিল। কাকা আমাকে খুব মেরেছিল। দিদিকেও। দিদির বিয়ে ঠিক করে দিয়েছিল।

ধুসস, এসব কথা আপনাকে কেন বলছি? আপনাকে বরং সুজাতার কথা বলি। সুজাতা বলত আর আমি শুধু শুনে যেতাম। ও বলত আপনি ওকে একদম সময় দেন না, ঘুরতে নিয়ে যান না, বাড়িতে এসে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, বিছানার কোলবালিশটাও আপনার চেয়ে গরম... এইসব আগড়ুম বাগড়ুম কথা। আমি ওর কথায় বিশ্বাস করতাম। নিজের মতো যতটা পারি প্রবোধ দিতাম। ভয়েস চ্যাটে আমাদের আলোচনা ধীরে ধীরে উত্তাপ ছড়াতে লাগল। তারপর একদিন ভিডিও চ্যাটে ও আমাকে নিজের সব কিছু খুলে দেখাল। কিছু মনে করবেন না, বিয়ের তিন বছর পরেও কোনও মহিলার এত আঁটসাঁট শরীর আমি আগে দেখিনি। দেখেই বোঝা যায়, খুব বেশি ব্যবহার হয়নি। আমি আর কী করি! নিজেকে ওর সামনে মেলে দিলাম। মানে সুজাতার অনুরোধেই। আর তা দেখে ও আপনাকে নিয়ে যা যা বলেছিল, সেসব বলে আর লজ্জায় ফেলতে চাই না। এভাবেই সব চলছিল। ভার্চুয়াল। কথাও ছিল কোনও দিন দেখা করব না। কিন্তু ওই যে বলে না, উপায় থাকলে ইচ্ছে হয়। এমন কপাল, ঠিক সেই সময় অফিসের কী একটা কাজে আপনি এক সপ্তাহের জন্য পাটনা গেলেন।

সুজাতাও আমাকে আপনার হরিপুরের বাড়িতে ডেকে নিল। আপনার বাড়িটা বেশ ভালো। একটেরে। আশেপাশে প্রতিবেশীদের ঝামেলা নেই। কে এল, কে গেল, কিচ্ছু বোঝা যায় না। সন্ধ্যার পর ঢুকতাম, ভোর ভোর বেরিয়ে আসতাম। সারারাত আপনার বিশাল ডবলবেড খাটে, সেই হলুদের উপর লাল গোলাপফুল আঁকা বেডকভারে শুয়ে

আমরা কী কী করেছি আপনি ভাবতেও পারবেন না। এটা বলতে পারি, সুজাতাকে সন্তুষ্ট করা মুশকিল। আপনার অপারগতা আমি বুঝি। তবে হ্যাঁ, ওই কটা দিন সুজাতা দারুণ খুশি ছিল। ওকে এত খুশি আমি আগে দেখিনি। ফিরে এসে আপনিও নাকি অবাক হয়ে গেছিলেন ওর খুশি দেখে! সত্যি মিথ্যা জানি না মশাই, ও আমাকে বলেছিল। আর যদি সেটা হয় তাহলে তো আমার একটা বড়ো "থ্যাঙ্ক" প্রাপ্য। আর তার বদলে আমাকে আপনি চোর বদনাম দিলেন!!

আপনার অফিসে কাজ বাড়তে লাগল আর আমাদের দেখা হওয়াও। মাঝে মাঝেই ও শপিং-এর নাম করে চলে আসত বারাসাতে। সোজা গিয়ে ঢুকতাম সিনেমা হলে। কোনও নামী সিনেমা হল না। এই আইনক্সের বাজারে যে কটা ঝড়তিপড়তি হল আছে, তাদের একটায়। ওখানে বক্স নামে অদ্ভুত একটা জিনিস আছে। প্লাইউডের পার্টিশন দিয়ে ছোটো ছোটো ঘরের মতো। ভিতরে সবাই দুজন দুজন বসে। কী সিনেমা চলছে, কে খবর রাখে! কিন্তু এটা আমার পছন্দের ছিল না। এসব সিনেমা হলে নাকি পুলিশের রেইড হয়, আর আপনি তো জানেন, আমি পুলিশে কত ভয় পাই।

সমস্যা এল অন্য জায়গা থেকে। সুজাতার মাথায় পোকা নড়ল। একদিন বলল সত্যিই এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করা যায় না। ও নাকি পালিয়ে যাবে। তাও আবার আমার সঙ্গে! আমার তো মাথায় বাজ। এই মহিলা বলে কী! আমি এমনিতেই কাঠবেকার। খাব কী আর খাওয়াব কী? কিন্তু আপনার ওই জেদি বউ আমার একটা কথা শুনলে তো... বলল টাকাপয়সা নাকি কোনও সমস্যাই না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি নাকি ওকে দারুণ বিশ্বাস করেন। আপনাদের সেভিংস অ্যাকাউন্টটাও নাকি জয়েন্ট ইত্যাদি প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের দরকার ছিল আরও টাকা। ও আপনাকে বোঝাল ব্যবসা করবে। শাড়ির। নাম দেবে "সুজাতার সম্ভার"(এখানে বলে রাখি, এই নামটা কিন্তু আমার ঠিক করা)। আপনিও অফিস থেকে লোন নিলেন। পঞ্চাশ লাখ টাকার। নতুন অফিস হবে। শো-রুম হবে। তাই বাড়ি খোঁজার একটা নাটকও হয়েছিল বোধহয়। আপনিও কাজ ফেলে দুদিন গেছিলেন, যতদূর জানি। কিন্তু এখানে আবার জানিয়ে রাখি, এর একটাও কিন্তু আমার প্ল্যান না। তলে তলে নিউ ব্যারাকপুরের কাছে একটা বাড়ি কেনার চক্রান্ত চলছিল, সেটা আপনি জানতেন না। আমি জানতাম। লোকাল নেতাদের টাকা খাইয়ে কম দামে আমিই বাড়িটার ব্যবস্থা করেছিলাম। আজকাল এমন বাড়ি পাওয়া মুশকিল। সামনে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। ঘাসের সবুজ লন। যেন মখমলের কার্পেট। দেখেই ঠিক করেছিলাম বাগান করব। আমার বাগানের খুব শখ। সেই ছোটোবেলা থেকে। গোলাপ বাগান। লাল গোলাপ। একটা লাল গোলাপ গাছ ছিল আমার। ছোটো ছোটো লাল লাল গোলাপফুলে গোটা গাছ ঢাকা। রোজ জল দিতাম। মাঝে মাঝে গোবর সার দিতাম। খোল পচা দিতাম। নাম রেখেছিলাম "লালমোহন।" ফেলুদার গল্পের মতন। যেদিন খুড়তুতো দিদির বিয়ে হল, ওরা লালমোহনকে কেটে ফেলল। কত কাঁদলাম। কেউ শুনল না। রেগে গিয়ে দিদির বাসরঘরের জানলা দিয়ে খাটে জ্বলন্ত মোমবাতি ফেলে দিয়েছিলাম। পুলিশ এসেছিল। সবাইকে জিজ্ঞাসা করল। আমাকেও। কাকা বলল, "ও-ই করেছে।" পুলিশ কাকার বন্ধু। আমাকে দোতলার ঘরে নিয়ে গিয়ে ল্যাংটো করে মারল। রুল দিয়ে। চারদিন উঠে বসতে পারিনি।

যাক গে সেসব কথা, সেই বাড়ি দেখে তো বাগান করব ঠিক করলাম। সুজাতাকে বললাম। কোনও উৎসাহ দেখাল না মাইরি! কেমন বউ আপনার? ফুল ভালোবাসে না। ফুল আর শিশু যারা ভালোবাসে না, তারা বড্ড নিষ্ঠুর হয়। মানুষ খুন করতে পারে। আমার মন দমে গেল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। আর নতুন করে ভাবার আর সময়

নেই। আমরা পালালাম। পালিয়ে প্রথম দুইমাস নাম ভাঁড়িয়ে কোথায় ছিলাম বলব না। আপনি তাহলে আমায় চিনে ফেলবেন। আমার পিছনে পুলিশ লাগাবেন। আমার পুলিশে বড্ড ভয়। যাবার আগে সুজাতা আপনাকে একটা চিঠি লিখে গেছিল। তাতে আপনাকে যৌন অক্ষম বলে যা যা লেখা ছিল, কোনও পুরুষমানুষ চাইবে না সে চিঠি অন্যের হাতে যাক। আমি জানি, পুরুষমানুষ সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু তাকে কেউ নপুংসক বলে গালি দেবে সেটা সহ্য করতে পারে না। আমি এটাও জানতাম ওই চিঠি কোনও দিন দিনের আলো দেখবে না। চিঠির বয়ান আমারই। যদিও লিখেছিল সুজাতা। আপনি এই নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেননি। পুলিশকে জানাননি। ঠিক করেছেন। বউ পালিয়েছে এটা কি ঢাকঢোল পিটিয়ে বলার মতো খবর?

সব ঠান্ডা হতে আমরা নিউ ব্যারাকপুরের ওই বাড়িতে থাকা শুরু করলাম। পালাবার আগেই গোলাপের চারা লাগিয়েছিলাম। সেগুলো বেশ বড়ো হয়ে লাল লাল ফুল দিত। কী সুন্দর গন্ধ! আমার খুড়তুতো দিদির বুকের গন্ধের মতো। কেন জানি না, সুজাতা বদলাতে থাকল। দিনরাত খিটখিট করত। মাথা গরম করত। ঝগড়া করত। ঠিক যেমনটা সুকন্যা করত বলে আমার সঙ্গে ব্রেক আপ হয়েছিল। আমি বারবার সুজাতাকে বলতাম ফুলে হাত না দিতে। গাছে হাত না দিতে। ও শুনত না। গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খোঁপায় লাগাতে চাইত। দু-একবার ঝগড়া করেছি। কিছু বললেই শুরু হত সেই বকবক বকবক। মাথার পোকা নড়ে যায়। শুরু হলে থামতেই চাইত না। ভয় দেখাত। বলত আমায় নাকি ফাঁসিয়ে দেবে। পুলিশে সব জানিয়ে দেবে। আমিও কেঁচো হয়ে যেতাম। আমার ওপর ওর টান শেষ হয়ে গেছিল। আপনার থেকে চুষে নেওয়া টাকাও তখন প্রায় শেষ। এমন সময় কী এক চাকরি নিল কে জানে। দেখলাম বাড়িতে অন্য পুরুষ ঢুকছে। ওদের কাউকে আমি চিনি না। ওরা ঢুকলে আমি বাগানে বেরিয়ে আসতাম। গোলাপ গাছে জল দিতাম। খোল পচিয়ে দিতাম। চা-পাতা ধোয়া জল দিতাম। আমি বেরিয়ে এলেই দরজা বন্ধ হয়ে যেত। রাতে আমরা আলাদা শুতাম। আলাদা ঘরে।

গত মাসের কুড়ি তারিখ বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত হল। আমি এক প্যাকেট বিড়ি কিনতে স্টেশনে গেছি। একটু এদিক ওদিক ঘুরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছি। গেটের ভিতরে পা দিতেই চমকে উঠলাম। আমার সব গোলাপ গাছ ফাঁকা। একটাও ফুল নেই। ঘরে ঢুকে দেখি আপনার বউ সুজাতা নিউ মার্কেট থেকে বড়ো বড়ো পিতলের ফুলদানি কিনে এনেছে। তাতে লম্বা লম্বা ডাঁটির সব গোলাপফুল কেটে কেটে সাজাচ্ছে। কিছু ফুল ওর পায়ের চাপে চটকে গেছে। অদ্ভুত এক লালচে তরল মেঝেতে দাগ তৈরি করেছে। আমি হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলাম। মুখ ভেটকে সুজাতা বলল, "এত ওভাররিঅ্যাক্ট করার কিছু নেই। কাল আমার বস মিঃ গুপ্ত আসবেন। বিশাল বড়োলোক। ঘরটা সাজিয়ে রাখতে হবে তো! আর শোনো কাল দুপুর দুপুর কোথাও বেড়িয়ে এসো। রাতের আগে এসো না।" আমার মাথা কাজ করছিল না। আমার চোখের সামনে লাল লাল চটকানো কিছু মৃতদেহ। আমার সন্তানদের মৃতদেহ। চোখের সামনে গোটা পৃথিবী দুলে উঠল।

আমি সেই রাতেই ওই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। আমার সন্তানদের মৃতদেহের মাঝে এক মুহূর্ত কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আশা করি সত্যিটা আপনি এতদিনে জানলেন। যদি আপনি ভদ্রলোক হন, তবে দয়া করে আর-একটি প্রেস কনফারেন্স করে এই মিথ্যে চুরির দায় থেকে আমাকে মুক্তি দিন।

আপনার মঙ্গল হোক।

ইতি

আপনার অপরিচিত এক হতভাগ্য।

পুনঃ- আমি যে সত্যিই চোর না তার প্রমাণ আমি দিতে পারি। আপনার যতটুকু টাকা অবশিষ্ট আছে, সব একটা গোলাপ কাঠের বাক্সে পুরে রেখেছি। বাক্সটা আপনিই সুজাতাকে বিবাহবার্ষিকীতে উপহার দিয়েছিলেন। বাড়ির সামনে বাগানের পাশের মাটিটা খুঁড়লে সুজাতার সঙ্গে ওই বাক্সটাও পাবেন।

একটু খেয়াল রাখবেন এই খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে আমার গাছগুলোর যেন কোনও ক্ষতি না হয়। ওরা আমার সন্তানসম।

ভালো থাকবেন। আমিও ভালো আছি। মাসখানেক হল স্ন্যাপচ্যাটের মাধ্যমে এক বিধবা মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছি। মহিলা দারুণ সুন্দরী। সবই ভালো, কিন্তু সুকন্যা আর সুজাতার মতো এও বড্ড বেশি বকবক করে।

লেখকের জবানি : ফেসবুকে কিছুদিন আগে একটা খবর দেখেছিলাম। এক বিবাহিত মহিলা ফেসবুক ফ্রেন্ডের জন্য স্বামীকে ত্যাগ করেছেন। স্বামীর বক্তব্য দোষটা সেই প্রেমিকের। সে নাকি টাকার জন্য তাঁর স্ত্রীকে ফুসলিয়েছে। তখনই মনে হয়েছিল ব্যাপারটা তো এমন নাও হতে পারে। ধরি মহিলা স্বেচ্ছায় ঘর ছাড়লেন। এবার তাঁদের কী হল? এইসব ভাবতে ভাবতে আচমকা এই প্লটটা মাথায় এল। লিখে ফেললাম।

কাঁটা

১

"কারা এল গো আমাদের হাউজিং-এ?" জানলা থেকে মুখ না সরিয়েই রণিতা প্রশ্ন করল।

"কে আবার আসবে? আমাদের এখানে আর ফ্ল্যাট খালি আছে নাকি! শেষ ফ্ল্যাটটা তো গত বছর সোহমরা কিনে নিল। মনে নেই?" পেপার ওলটাতে ওলটাতে আলগোছে উত্তর দিল দেবরাজ।

"আরে সেটাই তো ভাবছি! কিন্তু তলায় মুভারস অ্যান্ড প্যাকারস-এর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মালপত্র ডাঁই করা। ব্যাপার কী?"

"দ্যাখো কেউ ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাচ্ছে নাকি।"

এই ব্যাপারটা রণিতা ভেবে দেখেনি। কিন্তু সেটা হলে তারই সবার আগে জানা উচিত ছিল। রণিতার আড়ালে এই হাউজিং-এর বাসিন্দারা তাকে 'গেজেট' নামে ডাকে। কার হাঁড়িতে আজ কী চড়ল, কার বর সেক্রেটারির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে, কার ছেলে ড্রাগ নেয়, কার শালির মেয়ের অন্তরঙ্গ ছবি এখন হোয়াটসঅ্যাপে ভাইরাল, সব তার নখদর্পণে। সকালে রান্না শেষ করে দেবরাজ অফিসে বেরোতেই ঘরে তালা লাগিয়ে রণিতা বেরিয়ে পড়ে। "কি গো কী করছ?" বলে আজ এর ফ্ল্যাটে কাল ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে আড্ডা জমায়। কেউ দুঃখ প্রকাশ করলে সমবেদনা জানায়, আনন্দে ভাগ নেয়, আর এই করতে করতে সবার সব খবর কীভাবে যেন তার কাছে চলে আসে। শুধু ইনফরমেশনই না, তা সঠিকভাবে ব্রডকাস্ট করতেও রণিতার জুড়ি নেই। কোনও গোপন খবর জানতে গেলে তাকে একবারটি জিজ্ঞেস করলেই হবে। না করলেও যে জানা যাবে না তা না। এই যে রণিতাদের ঠিক উলটোদিকের ফ্ল্যাটে নতুন আসা দম্পতিদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভাব ভালোবাসা নেই, সেটা রণিতা না বললে কে জানত? ফ্ল্যাট কালচারে কে কার খবর রাখে? কিন্তু রণিতা রাখে। রণিতা নিজে ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে একদিন দেখেছে স্নিগ্ধার চোখ কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে। গালে কালশিটের দাগ। নিশ্চয়ই ওর বর সোহম ওকে মারে। আর একদিন ফ্ল্যাটের দরজা সামান্য খোলা ছিল। রণিতা পরিষ্কার শুনেছে সোহম স্নিগ্ধাকে বলছে, "আই উইল কিল ইউ বিচ।" রণিতার সঙ্গে স্নিগ্ধার সম্পর্ক বেশ ভালো। রণিতা মধ্য তিরিশ। স্নিগ্ধা সবে তেইশ পেরুল। তবু অসমবয়সি বন্ধুতা ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে উঠল দুজনের মধ্যে। স্নিগ্ধাও রণিতাকে অপছন্দ করত না। ছেলেমেয়ে নেই। ডাক্তার বলেছে হবেও না। কিছু তো একটা নিয়ে থাকবে মানুষটা। রণিতাও স্নেহ করত মেয়েটিকে। বাপ-মা মরা মেয়ে। মামারা ভালো ছেলে দেখে কম বয়েসেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এখনও সংসারের অ-আ-ক-খ শিখতে সময় লাগবে।

স্নিগ্ধার থেকে জানবে বলে দরজা খুলতেই রণিতার একগাল মাছি। ওরাই মালপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছে। মুভারস অ্যান্ড প্যাকারস-এর লোকজন জিনিসপত্র নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। কী আশ্চর্য!! এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটল, আর রণিতা আভাস মাত্র পেল না! তিনদিন আগে বর-বউয়ের ঝগড়া চরমে উঠেছিল। সাহস করে রণিতা ওদের ফ্ল্যাটে যায়নি। কিন্তু আজ আচমকা কী এমন হল?

প্রায় দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকল রণিতা। "এই শোনো, সামনের ফ্ল্যাটের স্নিগ্ধারা চলে যাচ্ছে, জানো..."

"ও", বলে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল দেবরাজ। "অন্য কোনও ভালো ফ্ল্যাট পেয়েছে বোধহয়।"

"কী যে বলো না তুমি! যদি সেরকমই হত, তাহলে আমি জানতাম না? স্নিগ্ধা নিশ্চয়ই আমাকে বলত।" বলেই যেন একটু চমকে উঠল রণিতা।

"এই শোনো না, সেই সেদিনের রাতে ওই ঝগড়ার পর তুমি স্নিগ্ধাকে আর দেখেছ?"

"কী করে দেখব? আমি সাতসকালে অফিস যাই, গভীর রাতে ফিরি। এই একটা দিন বাড়িতে থাকি। হাউজিং-এ কে কোথায় গেল, কী করল, সে দেখা কি আমার কাজ?"

"এইমাত্র একটা ব্যাপার মনে পড়ল। সেদিনের পর থেকে আমিও কিন্তু স্নিগ্ধাকে দেখিনি। প্রতিবার বরের সঙ্গে ঝগড়া হলেই পরের দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। দুঃখের কথা বলে। এবার আসেনি। আরও অবাক কাণ্ড, গত তিনদিন সোহম অফিস যাবার আগে ঘরের বাইরে তালা লাগিয়ে গেছে। তখন মাথায় আসেনি। এখন খেয়াল পড়ছে... হ্যাঁ, আমি শিওর।"

"কোথাও গেছে হয়তো..." দেবরাজ বলে।

"উঁহুঁ। স্নিগ্ধা বাজারে গেলেও আমাকে বলে যায়। আর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, আমাকে জানাবে না... হতেই পারে না। দাঁড়াও তো", বলেই পাশের ঘর থেকে মোবাইলটা নিয়ে আসে রণিতা। কল লিস্ট থেকে স্নিগ্ধার নম্বর ডায়াল করে কানে দিল।

"সুইচ অফ বলছে। কিন্তু ও তো ফোন সুইচ অফ করে না কক্ষনো। ওর চুঁচুড়ার বড়োমামি অসুস্থ। ওই মামিই ওকে মায়ের মতো মানুষ করেছে। কখন কী খবর আসে, সেই ভয়ে মোবাইল সারাক্ষণ খোলা রাখে। হোয়াটসঅ্যাপটা দেখি... এ কী! লাস্ট সিন তো তিনদিন আগে দেখাচ্ছে। যে মেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়া থাকতে পারে না, সে গত তিনদিনে একবারও..." নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে চলল রণিতা।

"এই যে, কি গো, চলো না একবার আমার সঙ্গে... সামনের ফ্ল্যাটে। ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে আসি", বলে দেবরাজকে তাড়া লাগাল রণিতা। দেবরাজের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না কে এল, কে গেল তা দেখার। কিন্তু তার স্ত্রীকে সে চেনে। মাথায় একবার গোয়েন্দাগিরির শখ জাগল তো পৃথিবীর কোনও কিছু তাকে ঠেকাতে পারবে না।

"অগত্যা..." বলে রবিবারের পত্রিকাটা পাশের টেবিলে সশব্দে ফেলে উঠে দাঁড়াল দেবরাজ।

সোহম-স্নিগ্ধাদের ফ্ল্যাটটা নতুন রং করা। হালকা হলুদ রঙের ইন্টেরিয়র। দরজা খোলা। দরজায় কাঠের নেমপ্লেটে "সোহম বসু/ স্নিগ্ধা বসু" লেখা। দুটো ষণ্ডা প্রকৃতির লোক একটা কার্ল-অনের গদি দরজা দিয়ে বার করছে। ওদের দেখে "একটু সাইড দেবেন প্লিজ" বলতেই ওরা সরে দাঁড়াল। ঘর প্রায় ফাঁকা। শুধু বুকশেলফের বইগুলো কিছুটা সরানো বাকি। ঘরে ঢুকে এ ঘর ও ঘর করল রণিতা। দেবরাজ মানা করল, তবুও। টু-বিএইচকে ফ্ল্যাটের দুটো ঘর, এমনকি বাথরুমেও কেউ নেই। কাবার্ড খুলে দেখল রণিতা। থরে থরে কাপড় সাজানো। বেশিরভাগই স্নিগ্ধার।

"আরে! দ্যাখো দ্যাখো, এটা কীরকম হল? স্নিগ্ধার ঘরে পরার মাত্র তিনটেই নাইটি ছিল। আমায় দেখিয়েছিল। তার মধ্যে এই গোলাপিটা তো ওর ফেভারিট। একটাও না

নিয়েই চলে গেছে! আমার কেমন যেন ভালো ঠেকছে না।"

ভালো ঠেকছিল না দেবরাজেরও। অন্যের বাড়িতে না বলে, না জানিয়ে এভাবে তদন্ত করাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না সে। আর তখনই রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়ল দেবরাজের। মাঝখানে বেখাপ্পাভাবে একটা কার্পেট গুটিয়ে আছে। উপরে নিচে দড়ি বাঁধা। সেদিকে এগোতেই একটা পচা গন্ধ নাকে এল। চাপা, কিন্তু স্পষ্ট। আর ঠিক তখনই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল সোহম।

২

ঢুকে প্রথমে থতোমতো খেয়েই রণিতাকে দেখে একগাল হাসল সে। "আরে বউদি! আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম। দাদাও আছেন। ভালোই হল।"

"আমাদের অপেক্ষায়? কেন ভাই?" রণিতা একটু অবাক হল।

"চেনাজানার মধ্যে আপনারাই তো আছেন। আমিই যেতাম আপনাদের কাছে। আমরা এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছি। আমার ট্রান্সফার হয়ে গেছে। কালিম্পং-এ। ওখানেই থাকব এখন।"

"আর এই ফ্ল্যাট?"

"থাকবে। তালাবন্ধ। দেখি যদি কোনও খদ্দের পাই। আপনারাও দেখবেন। আমার নম্বর দিয়ে যাব। জানাবেন।"

"বলছি... স্নিগ্ধা কোথায়?" অপ্রিয় প্রশ্নটা রণিতাই করল।

আচমকা এই প্রশ্নটা আসবে বোঝেনি সোহম। এই প্রথম ওর কনফিডেন্সে চিড় ধরল যেন।

"ও... মানে... ও আগেই চলে গেছে। কালিম্পং-এ। মানে গোছগাছ করতে হবে তো... তাড়াহুড়োতে বলে যেতে পারেনি হয়তো। আমাকে বলেছে, দিদিকে বলে দিয়ো।"

"ওর ফোন সুইচ অফ কেন? আরও হোয়াটসঅ্যাপও চেক করছে না গত তিনদিন।" দেবরাজ বুঝল রণিতা সহজে হাল ছাড়বে না।

এবার সোহমকে সত্যি সত্যি বেশ বিব্রত দেখাল। "ওহ। হ্যাঁ... ওর মোবাইলের ব্যাটারিটা কদিন হল গেছে। নতুন মোবাইল আর কেনা হয়নি। দেখি, কালিম্পং-এ গিয়ে, সব গুছিয়ে..."

গোটা ব্যাপারটাই কেমন সন্দেহজনক লাগছিল দেবরাজের। এতক্ষণ লাগেনি। এবার লাগল। সোহম কি কিছু লুকাতে চাইছে? আর অকারণে বারবার রান্নাঘরের দিকেই বা তাকাচ্ছে কেন?

"রান্নাঘরে কী একটা যেন পচেছে, একটু দেখব নাকি?" এবার দেবরাজ গলা খাঁকরে প্রশ্ন করল।

বলামাত্র সোহমের চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। প্রায় ছুটে গিয়ে "মরা ইঁদুর-টিঁদুর হবে" বলেই দরজার কপাটটা লাগিয়ে দিল হুড়মুড়িয়ে। "রান্নাঘরে ইঁদুরের উৎপাত। তাই বিষ দিয়েছিলাম", বলে ফ্যাকাশে একটা হাসির চেষ্টা করল সে।

দেবরাজের গোটা ব্যাপারটাই একটা ভয়ংকর ষড়যন্ত্র বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু কিছু করার নেই।

সিঁড়ি বেয়ে দুজনেই নেমে এল নিচে। দুজনেই চুপচাপ। দেবরাজ বুঝল, সে যা ভাবছে রণিতাও ঠিক সেটাই ভাবছে। রণিতার নাকেও নিশ্চিত সেই পচা গন্ধ ঢুকেছে। আর যদি তাদের ভাবনা সত্যি হয়, তাহলে তাদের চোখের সামনে দিয়ে কুৎসিততম অপরাধ করে অপরাধী পালিয়ে যাবে, আর তারা চুপ করে বসে থাকবে।

মুভারস অ্যান্ড প্যাকারস-এর লোকদুটো গাড়িতে মাল ওঠাচ্ছিল। যেন এমনি, এমন করে হালকা গলায় রণিতা তাদের প্রশ্ন করল, "দাদা এই মাল কালিম্পং যেতে কতদিন লাগবে?"

লোকদুটো কাজ থামিয়ে অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকাল। "কী বললেন দিদি? বুঝলাম না।"

"মানে, এইসব জিনিসপত্র তো কালিম্পং যাচ্ছে, যেতে রাস্তায় কতদিন লাগতে পারে?"

"ভজা... এই ভজা... এ দিদি কী বলছে দেখ তো... মাল কোথায় একটা যাবে..." বলতেই ড্রাইভারের জানলা দিয়ে একটা মুখ বেরিয়ে এল।

"কী বলছেন দিদি?"

"বলছি, এই সব মাল কালিম্পং যাচ্ছে তো?"

"না দিদি, বড়বাজারে যাচ্ছে। বাবু তো আমাদের মালিকের কাছে সব বেচে দিয়েছেন। উনি নাকি বিদেশ যাচ্ছেন। আর ফিরবেন না। তাই..."

দেবরাজ আর রণিতা স্তম্ভিত হয়ে একে অন্যের দিকে চেয়ে রইল। সোহম বিদেশে পালাচ্ছে। আর একবার বিদেশে গেলে তার টিকিটাও ছোঁয়া যাবে না। আর যদি তাদের ধারণা সত্যি হয়, তাহলে সোহম একাই যাচ্ছে। কারণ স্নিগ্ধার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। সে কার্পেট জড়িয়ে শুয়ে আছে এই ফ্ল্যাটেরই রান্নাঘরে। অনেকদিন পরে যখন তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

নিজেদের ঘরে যখন ফিরল তারা, তখন দুজনেরই মুখ থমথমে। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। আর কয়েক ঘণ্টা হাতে পেলেই অঘটন ঘটবে। দক্ষিণ কলকাতার এই হাউজিং-এ কেউ কারও খবর রাখে না। তারা না থাকলে সোহমের পালিয়ে যাওয়া কেকওয়াকের মতো মসৃণ হত। কিন্তু না। তারা থাকতে এ জিনিস হতে দেওয়া যায় না।

"তোমার বন্ধুর বাবা তো পুলিশের আইজি। তাঁকে ফোন করলে হয় না?" রণিতাই প্রথম কথা বলল।

"কাকুকে ফোন করতে চাইছি না। এই সামান্য ব্যাপার..." বলতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল রণিতা। "সামান্য ব্যাপার? মেয়েটাকে খুন করে ফেলে রেখে বিদেশে পালাচ্ছে। একটার পর একটা মিথ্যে কথা বলছে। আর ওই গন্ধ, তুমি পচা গন্ধ পাওনি?"

"বলল যে ইঁদুরের..." মিনমিন করে একটা প্রতিরোধ তৈরির চেষ্টা করল দেবরাজ।

"তমি চুপ করো তো। আমি শিওর ওটা স্নিগ্ধা ছাড়া কেউ না। বাপ-মা মরা মেয়েটাকে খুন করেছে জানোয়ারটা। আগেও মারত। সুযোগ পেলেই মারত। এবার একেবারে প্রাণে মেরে ফেলেছে", রণিতার চোখে জল উপচে পড়ল। "আর তুমি কী ভেবেছ, এই বডি উদ্ধার হবে না? আর হলে পুলিশ তোমায় ছেড়ে কথা বলবে? সব কিছু জেনে বুঝে

খুনিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তোমাকেও রেয়াত করবে ভেবেছ? শেষে তোমাকে না ঘানি টানায়..”

দেবরাজ ভীতু মানুষ। তাও খানিক ভেবেচিন্তে মোবাইলে ডায়াল করল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “কাকু, আমি দেবরাজ বলছি। একটা ঘটনা ঘটে গেছে...”

এর পরের কয়েক ঘণ্টা যে কেমন করে কাটল দুজনের তা আর বলার না। দুপুরে ভালো করে খাওয়া হল না। বিশ্রাম হল না। একটা কী হয়, কী হয় ভাব। দুপুর দুটো নাগাদ বাড়ির সামনে একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল। রণিতার খুব ইচ্ছে ছিল বেরিয়ে দেখার। দেবরাজ মানা করল। নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে যাবার দরকার নেই। পুলিশের গাড়ি সোহমকে নিয়ে রওনা হল। রণিতা দোতলার জানলা দিয়ে দেখতে পেল। এবার থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চলবে। তারপর পুলিশ আসবে ওদের কাছে। ওদের সাক্ষ্য নিতে। ডিটেকটিভ বই পড়ে আর টিভি-তে ক্রাইম পেট্রল দেখে রণিতা এই সব কিছু জানে। সন্ধে সাতটা নাগাদ গাড়ির আওয়াজ পেয়েই জানলা দিয়ে উঁকি দিল রণিতা। পুলিশের গাড়িটা ফিরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজকে খবর দিল সে। “পুলিশ আবার এসেছে। আমাদের সাক্ষ্য নেবে। রেডি হও।” কয়েক সেকেন্ড বুক ঢিপ ঢিপ। তারপর তীব্রস্বরে বেজে উঠল ডোরবেল।

প্রায় ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল রণিতা।

খুলেই দেখল স্নিগ্ধা দাঁড়িয়ে। জীবিত এবং হাস্যময়।

৩

খানিকক্ষণ রণিতা কথা বলতে পারেনি। মনে মনে সে স্নিগ্ধাকে এতটাই মেরে ফেলেছিল যে, সেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব। প্রায় ভূত দেখার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল রণিতার মুখ। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা দেবরাজেরও একই অবস্থা। প্রথম কথা বলল স্নিগ্ধাই, “দ্যাখো তো বউদি, আমাদের ঝগড়াঝাঁটির জন্য সবাইকে কেমন হ্যারাস হতে হল।”

মুখে কথা জোগাচ্ছিল না রণিতার। তবু কোনওক্রমে বলল, “আরে আগে ভিতরে এসো...”

ভিতরে এসে বসল স্নিগ্ধা। দেবরাজ পাশের ঘরে একটা বই নিয়ে বসল। কান রইল ওই ঘরেই। স্নিগ্ধা বলছিল, “তুমি তো জানোই বউদি, বিয়ের পর থেকে আমাদের অশান্তি। কারণটা এতদিন বলিনি। আজ বলছি। ওর অফিসের এক কলিগ। অবাঙালি মেয়ে। নাম জানি না। বলে না। রাতবিরেতে ফোন আসত, ও ফিসফিস করে হিন্দিতে কথা বলত। ফোনে লেখা শুধু “অফিস”। সেদিন হোয়াটসঅ্যাপে ওদের চ্যাট দেখে ফেলেছিলাম বউদি। কী নোংরা, কী নোংরা... তোমায় কী বলব। আমার বরটিও তেমনি। লিখেছে, “আর বেশিদিন নেই, তোমার পথের কাঁটা দূর হবে।” মানে কী? আমায় ছেড়ে দেবে, তাই তো? পরশু দিন এই নিয়েই ঝগড়া চরমে ওঠে। আমি রাগ করে ওর মোবাইল আছড়ে ভেঙে ফেলে রাত একটা নাগাদ এক পোশাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি। সারারাত হাওড়া স্টেশনে কাটিয়ে পরদিন চুঁচুড়ায় মামাবাড়ি চলে গেছিলাম। ঠিকই করেছিলাম আর ফিরব না। মোবাইলও নিইনি। ও এখন সেটা ইউজ করছে...”

“তারপর?” রণিতার বিস্ময় তখনও কাটেনি।

"তারপরই তো অদ্ভুত ব্যাপার। গত তিনদিন রোজ সোহম অফিস ফেলে আমার মামাবাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকত। কতবার যে ক্ষমা চেয়েছে, ঠিক নেই। এমনকি কেঁদেছে অবধি। আমি তাও ঠিক করেছিলাম কিছুতেই ফিরব না। আজ শুনলাম সব জিনিসপত্র বেচে দিয়ে বিবাগি হবার শখ চেপেছিল বাবুর। আর তা দেখে কারা যেন পুলিশে ফোন করে বলেছে ও নাকি আমায় খুন করে পালাচ্ছে। বোঝো কাণ্ড। এর পর আর রাগ করে থাকা যায়, তুমিই বলো। ওকে তো থানাতেও নিয়ে গেছিল। ওখান থেকেই মামার বাড়ি ফোন করে। আমি এসে ওকে ছাড়াই।"

এতক্ষণে রণিতার মুখে হাসি ফোটে। "যাক বাবা! যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে। বর বউয়ের এমন কত ঝগড়া হয়! এসবে পাত্তা দিলে চলে? যাক গে। আবার মালপত্র গুছিয়ে নাও, আর আজ রাতে তোমাদের দুজনের আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন রইল, কেমন?"

৪

সেদিন রাতে ওরা খেয়েদেয়ে যেতে যেতে প্রায় এগারোটা হল। রণিতা একটু বেশিই উচ্ছলতা দেখাচ্ছিল। একটু বুদ্ধিমান মানুষই বুঝতে পারবে এই অতিঅভিনয়টা। সোহম নিজে চুপচাপ খাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে রণিতার দিকে স্থির চোখে তাকিয়েছিল। দেবরাজের চোখ এড়ায়নি। খেতে খেতে দুবার উঠেছিল সোহম। একবার ওর অফিসের বসের ফোন এসেছিল, আর একবার টয়লেটে। দ্বিতীয়বার দেবরাজকেও উঠতে হয়েছিল স্টোর রুম থেকে সসের বোতলটা আনতে... টয়লেটে আধভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে সোহমের গলার আওয়াজ পেয়েছিল দেবরাজ। চাপা গলায় হিন্দিতে কারও সঙ্গে কথা বলছে সে... "অউর কভি ভি কোই লাফড়া নেহি হোগা। সব সেটিং কর দিয়া ম্যায়নে..." কার সঙ্গে কথা বলছিল সোহম? কী সেটিং করেছে? জিগস পাজলের একটা হিসেব কোথাও যেন মিলছে না... সেটা কী বুঝতেও পারছে না ছাই...

রাত্রে ঘরে ঢুকে বিছানায় ধপাস করে বসল রণিতা। "বাস রে! আর কোনও দিন যদি কারও পার্সোনাল ব্যাপারে নাক গলাই! কী ভাবলাম, আর কী দাঁড়াল। ছি ছি। এরপর যাই হোক, মাল নিয়েই চলে যাক, আর বাড়ি বেচেই চলে যাক, আমি আর ওর মধ্যে নেই। সবাই যেমন চোখ বন্ধ করে থাকে, আমিও থাকব।"

রণিতার কথায় সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল দেবরাজের কাছে । জিগস পাজলের শেষ টুকরোটা... এবার সব মিলে যাচ্ছে খাপে খাপে। একটা অসামান্য ধূর্ত আর শয়তানি প্ল্যান তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে, কিন্তু আর কিচ্ছু করার নেই। সোহম সব সেটিং করে দিয়েছে...

তাদের নিজের ঘরে দেখে প্রথমেই সোহম বলেছিল, "আরে বউদি! আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম।" সোহম রণিতার জন্য অপেক্ষা করছিল? কেন? কেন অকারণে কালিম্পং-এর মিথ্যে কথা বলল কিংবা ইঁদুরের মরার গন্ধ ঢাকতে সাততাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। গোটাটাই যেন সাজানো এক প্লট, যাতে সবাই সোহমের ইচ্ছেমতো অভিনয় করে গেছে। এ হিসেব অন্য কিছুতেই মেলে না। মেলে শুধু একভাবে।

সোহম চাইছিল রণিতারা তাকে সন্দেহ করুক। ওরা পুলিশে জানাক। ও খুব ভালো জানত পুলিশ কিস্যু করতে পারবে না। এটা কোনও কেসই না। আর এটাও জানত, এই ঘটনা এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার একইভাবে ঘটলে রণিতা হোক বা পুলিশ, কেউ

ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেবে না। সেই রাখাল ছেলের গল্পের মতো। রণিতা তো এইমাত্র বলে গেল, "আমি আর ওর মধ্যে নেই।" আর সেবার সোহম নিশ্চিন্তে সেটাই করবে যার রিহার্সাল ও এবার করল...

সোহম জানে এই গোটা হাউজিং-এ কেউ কারও ব্যাপারে মাথা গলায় না। ফলে সোহমের ঘৃণ্য প্ল্যান কার্যকরী করার পিছনে একটাই বাধা ছিল। রণিতা।

আজ দারুণ কৌশলে সোহম সেই পথের কাঁটাটাও দূর করল।

লেখকের জবানি : নন-ক্রাইম ক্রাইম স্টোরি হল সেরকম গল্প, যাতে আদতে কোনও অপরাধ হয় না, কিন্তু অপরাধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। শেষে গোটাটাই পাঠকের কল্পনার ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্প্যানিশ ভাষায় এমন কয়েকটা গল্প থাকলেও বাংলায় (এমনকি ইংরাজিতেও) প্রায় নেই বললেই চলে। একেবারেই পরীক্ষামূলকভাবে তাই এই গল্পটা লেখা।

পোস্টকার্ড

১

ঝাঁ চকচকে হাউজিং-এর এই ফ্ল্যাটে ভাড়া আসার এক সপ্তাহের মধ্যে ধৃতি বুঝল এখানে না এলেই হত। একে তো ভাড়া বেজায় বেশি, কতদিন দিতে পারবে জানে না, আর তার চেয়েও বেশি মুশকিল হাউজিং-এ সে ছাড়া সবাই বেশ হোমরাচোমরা লোক। কেউ কাউকে পাত্তা দেয় না। কথা বলা, আলাপ করা দূরে থাক। টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ার একেবারে কাছে এত সুন্দর ফ্ল্যাট ভাড়া পেয়ে সহজে ছাড়তে চায়নি। এমনিতেই এই তার প্রথম কলকাতায় থাকা, তাও একা। মা কিছুদিন এসে ছিলেন, কিন্তু তিনিও আর কতদিন থাকবেন। মূলত দুটো কারণে এই ফ্ল্যাট পছন্দ হয়ে গেছিল ধৃতির। তার ব্যালকনি থেকে কলকাতার স্কাইলাইনের অনেকটা দেখা যায়। এই নিঃসঙ্গ জীবনে ওটুকুই তার অক্সিজেন। দ্বিতীয়, ফ্ল্যাটের একটা ঘরে ঠাসা মেঝে থেকে দেওয়াল অবধি নানা দেশি বিদেশি বই। এ জিনিস সবার ভাগ্যে জোটে না।

ধৃতির আগে এখানে থাকতেন বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার সুপ্রিয় বসু। অকৃতদার। কোনও ওয়ারিশ নেই। তিনি মারা যাবার পর এই ফ্ল্যাট তালাবন্ধ ছিল। দালাল প্রথমে আমতা আমতা করছিল বটে, 'আসলে একটা ঘর কিন্তু পুরো বইতে ভরা, ওটা ইউজ করতে পারবেন না', আর সেটা শুনেই ধৃতি লাফিয়ে উঠে এই ফ্ল্যাটটাই নিল।

ধৃতি সবে জার্নালিজম পাশ করে বীরভূম থেকে পাকাপাকি কলকাতায় এসে আছে। এখন একটা সংবাদ চ্যানেলে ফ্রিলান্সে কাজ করে। বড়োলোকের মেয়ে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে চাকরিটা নিয়েছে। দুপুর নাগাদ অফিসে যায়, গভীর রাতে অফিসের গাড়ি এসে ফ্ল্যাটের সামনে ছেড়ে দিয়ে যায়। এখন বাজারে একটাই খবর। সুপ্রিয় বসুর লেখা শেষ স্ক্রিপ্ট 'বিষণ্ণ সকাল' থেকে তৈরি সিনেমা দুই সপ্তাহ আগে রিলিজ করেছে। আর রিলিজ হতেই সুপারহিট। এত বড়ো ওপেনিং সুপ্রিয় বসুর আগের কোনও ছবি পায়নি। কারণটাও ধৃতি আন্দাজ করতে পারে। সুপ্রিয় বসুর মৃত্যু। সুপ্রিয় বসুর মৃত্যুকে ঠিক স্বাভাবিক মৃত্যু বলা যায় না।

২

এক মাস আগে যখন সুপ্রিয় বসুর মৃত্যু হল, তখন কাগজে কাগজে হেডলাইন হয়েছিল এই নিয়ে। সুপ্রিয় বসুর বয়স হয়েছিল, খিটখিটে হয়ে পড়ছিলেন। শেষের দিকে বর্তমান সরকারের একেবারে পিছনে পড়ে গেছিলেন। পত্রিকা হোক বা টিভি সাক্ষাৎকার, সুযোগ পেলেই সরকারকে তুলোধোনা করতে ছাড়তেন না। তাই তাঁর মৃত্যুর তেমন কোনও তদন্তও হয়নি। এমনিতে দেখতে গেলে মৃত্যুতে রহস্যের কিছু নেই। ছয়মাসে একদিন লাইব্রেরি গোছাতেন সুপ্রিয়। সেদিনও তেমনই একদিন ছিল। সকাল থেকে ঘরাঞ্চির মাথায় উঠে তাকের বই সাজাচ্ছিলেন। বাড়ির কাজের মহিলা দেখেছে। এমনকি দারোয়ান একবার কী কাজে এসেছিল, সেও তাঁকে ঘরাঞ্চির মাথায় দেখেছিল। সে নাকি সুপ্রিয়বাবুকে সাহায্যের অফারও করে। সুপ্রিয় রাজি হননি। শুধু বলেন বেরিয়ে যাবার

সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যেতে। দারোয়ান সেটাই করেছিল। ইয়েল লক। ভিতর থেকে না খুলে দিলে কারও ঢোকা সম্ভব না। পরদিন কাজের মহিলা এসে দ্যাখে দরজা বন্ধ। কলিং বেল বাজিয়েও কোনও কাজ হয়নি। সে দারোয়ানকে জানায়। দারোয়ান পুলিশকে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঢুকে দ্যাখে ঘরাঞ্চি একদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে আর পাশেই ঘাড় মটকে মরে পড়ে আছেন চিত্রনাট্যকার সুপ্রিয় বসু। তাঁর জীবনের চিত্রনাট্য যে এত করুণ ভাবে শেষ হবে তা কেউ বোঝেনি। প্রাথমিক তদন্তের পর গোটা ঘটনাকে অ্যাক্সিডেন্ট তকমা দিয়ে কেস ক্লোজ করে দেওয়া হয়। ধৃতির জার্নালিজমের কোর্স সবে শেষ হয়েছে তখন। নিয়মিত খবর রাখত সে, কোনও অন্যরকম ক্লু বেরোয় কি না। কিন্তু সে গুড়ে বালি। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল দুর্ঘটনা। পুলিশ বারবার সিসি টিভি ফুটেজ দেখেছে। কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখা যায়নি। ঘরের জানলা, ব্যালকনির দিকে দরজা, সব ভিতর থেকে বন্ধ। ফাউল প্লে-র কোনও অবকাশই নেই।

সেদিন শুক্রবার। ধৃতির ছুটি ছিল। একটু দেরি করেই দশটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠেছে। ব্রেকফাস্ট বানিয়ে ল্যাপটপে নেটফ্লিক্স ওয়েব সিরিজ ছেড়ে বসল ধৃতি। কাউকে না বললেও ওর মনে মনে একটা গোপন ইচ্ছে আছে। স্ক্রিপ্ট রাইটার হবার। কিন্তু সেই সুযোগ দেবে কে? কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে একটু আনমনা হয়েই সিনেমা দেখছিল ধৃতি। এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল। ধৃতি এই ফ্ল্যাটে আসার পর প্রথমবার তার কলিং বেল বাজল। ধৃতি উঠে দরজা খুলে দিতেই দ্যাখে ওয়াচম্যান হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা পোস্টকার্ড।

— ম্যাডাম, আপনার একটা চিঠি আছে।

— চিঠি? আমার নামে?

— না, আসলে সুপ্রিয় স্যারের নামে চিঠি। কিন্তু আমাদের তো সব চিঠি পিওনবুকে রিসিভ করে নিতে হয়, তাই যে ঠিকানার চিঠি, সেখানেই পৌঁছে দিই। সুপ্রিয় স্যার মারা যাবার পর আপনিই তো এসেছেন, তাই হিসেবমতো এ চিঠি আপনাকে দেবার কথা। আপনি না নিলে নাও নিতে পারেন। শুধু এই খাতায় একটা সই করে দিন। আমার চাকরি বাঁচাই...

— না, না, এনেছ যখন দাও। কিন্তু উনি মারা গেছেন মাসখানেক হল। সবাই জানে। এখন কে আবার ওঁকে চিঠি লিখছে?

খাতায় সই করে চিঠিটা নিয়ে নিল ধৃতি। চিঠিটা লেখা হয়েছে দিন তিনেক আগে। গোটা গোটা হরফে লেখা—

বন্ধু সুপ্রিয়,

তোমার চিঠি যথারীতি পেয়েছি। এই নিঃসঙ্গ জীবনে তোমার চিঠিগুলোই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। তুমি লিখেছ 'বিষণ্ণ সকাল' নাকি দারুণ হিট হয়েছে। এ যে কত বড়ো আনন্দের সংবাদ, তা আমি তোমায় বলতে পারি না। তোমার কথামতো আমি এই চিঠিতে নতুন গল্পটার শেষাংশ পাঠাচ্ছি। তুমি সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখো।

এর পরে সাত-আট লাইনে একটা প্লটের শেষ অংশের খসড়া। যদিও মূল কাহিনির শুরুটা ধৃতি জানে না, তবে শেষটা যে জব্বর সেটা বুঝতে পারল।

চিঠির শেষে সই, তোমার বন্ধু অরবিন্দ।

ধৃতি চিঠিটা বার তিনেক পড়ল। পোস্টমার্ক ভিজে গেছে, তাই কোথা থেকে এসেছে বলা মুশকিল। তবে মাত্র তিন দিনে ডেলিভারি হয়েছে যখন, কাছাকাছিই হবে। কে এই অরবিন্দ? ভাবতে গিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল ধৃতির শিরদাঁড়া বেয়ে। সুপ্রিয় বসু মারা গেছেন এক মাস আগে। আর 'বিষণ্ণ সকাল' রিলিজ করেছে মাত্র দুই সপ্তাহ হল। তাহলে মৃত ব্যক্তি চিঠিতে ছবির সাফল্যের কথা জানালেন কীভাবে?

৩

জার্নালিজম ক্লাসের সময় সন্দীপ স্যার একটা কথা খুব বলতেন। প্রতিটা ভালো জার্নালিস্ট আসলে একজন ভালো গোয়েন্দা। এই চিঠি পড়ে ধৃতির মধ্যে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার ইচ্ছে উসকে উঠল। কিন্তু শুরু কোথা থেকে করা যায়? হাউজিং-এর এই ফ্লোরে আর দুটোই ফ্ল্যাট। একটাতে থাকেন এককালের ডাকসাইটে অভিনেত্রী রোশনি মিত্র আর অন্যটায় ওয়েব সিরিজের উঠতি পরিচালক সাগ্নিক চ্যাটার্জি। দুজনেই একা থাকেন। রোশনির সঙ্গী অবশ্য বিরাট দুটো ল্যাব্রাডর কুকুর। ধৃতি দেখেছে প্রায়ই রোশনি এঁদের নিয়ে নিচে হাওয়া খাওয়াতে বেরোন। সুপ্রিয় বসুকে নিয়ে কিছু বলতে পারলে এই দুইজনই পারবেন। কিন্তু ধৃতি সবে তেইশ বছরের ইন্টার্ন। ওঁরা ধৃতিকে খুব একটা আমল দেবেন বলে মনে হয় না। আর গায়ে পড়ে প্রশ্ন করাটাও ধৃতির কেমন কেমন লাগছিল।

সুযোগ এসে গেল ভাগ্যক্রমে। পরের দিনই রোশনি তাঁর একটা কুকুর নিয়ে সবে বেরোচ্ছেন, ধৃতিও ঘর থেকে বেরিয়েছে নিচে নেমে কিছু কেনাকাটা করবে বলে। আচমকা কুকুরটা রোশনির হাত ছেড়ে সোজা ধৃতির গায়ে লাফ দিল। এমনিতেই কুকুরে ধৃতির বেজায় ভয়। গায়ে লাফিয়ে উঠতেই "মা গো" বলে একেবারে অজ্ঞান। জ্ঞান হারাবার আগে সে রোশনির গলায় 'কোকো, কোকো' শুনতে পেয়েছিল কয়েকবার।

জ্ঞান যখন ফিরল, ধৃতি দেখল সে অন্য একটা ফ্ল্যাটে শুয়ে আছে। ফ্ল্যাটে প্রচুর জিনিসপত্র, কিন্তু অগোছালো। পাশের একটা ঘর থেকে দুটো কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সে সোফায় শুয়ে। পাশেই চেয়ারে উদবিগ্ন মুখে বসে আছেন অভিনেত্রী রোশনি মিত্র। তাঁর হাতে একটা কাচের গোল গ্লাস, তাঁর সেই গ্লাসের ভিতরের তরলটা যে কোকাকোলা নয় সেটা এই অবস্থাতেও বুঝতে পারল ধৃতি। সে চোখ মেলে তাকাতেই রোশনি হাতের গেলাস রেখে তার পাশে এসে বসলেন।

— কী ব্যাপার? এখন ঠিক আছ?

মাথা নেড়ে কোনওক্রমে হ্যাঁ বলল ধৃতি।

— আসলে আমারই ভুল। কোকোটা খুব দুরন্ত। ওর চেনটা আরও শক্ত করে ধরে রাখা উচিত ছিল। আয়াম স্যরি। আমি বুঝিনি তুমি এত ভয় পেয়ে যাবে।

ধৃতি ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। মাথাটা একটু টলমল করছে। সে উঠে বসার চেষ্টা করল।

— আরে উঠতে হবে না। একটু রেস্ট নাও। শুয়ে শুয়েই কথা বলো। আমি ডাক্তার ডেকেছিলাম। তিনি দেখে বলেছেন ভয়ের কিছু নেই। একটা প্রাইমারি শক। তোমার নাম কী? কী করো? বাড়ি কোথায়?

— আমি ধৃতি রায়চৌধুরী। বাড়ি বোলপুর। এখানে নিউজ ২০-তে ইন্টার্নের কাজ করছি।

— ও, জার্নালিস্ট? তোমাদের বস অর্জুন তো আমার বেশ পরিচিত। ভালো ছেলে। এককালে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আমার সিনেমাগুলোর রিভিউ ও-ই করত। এখন অনেকদিন কথা হয় না। তুমি ১৯ বি-তে এসেছ, তাই না?

— হ্যাঁ, সুপ্রিয় বসুর ফ্ল্যাট। আপনি নিশ্চয়ই চিনতেন ওঁকে?

মুখে অদ্ভুত একটা হাসি খেলে গেল রোশনির। এ হাসি আনন্দের না। দুঃখের।

— যে আমার জীবন শেষ করে দিল, তাকে চিনব না?

— মানে? কীভাবে?

'তুমি বাচ্চা মেয়ে। কলকাতায় থাকো না, তাই জানো না। নইলে সবাই জানে', হাতের গেলাসে এক সিপ দিয়ে বললেন রোশনি। 'বছর দু-এক আগেকার কথা। আমার স্বামী, মেয়ে তখন আমার সঙ্গেই থাকত। এই ফ্ল্যাটেই। আমার স্বামী কর্পোরেট সার্ক। প্রায়ই দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াতেন। মেয়ে হোস্টেলে। সেই সময় আমার প্রযোজক রাজীব আগরওয়ালের সঙ্গে আমার একটা রিলেশান হয়। গোপনে। যাতে কেউ না বুঝতে পারে, তাই গভীর রাতে ও আমার ফ্ল্যাটে যাতায়াত করত। বুড়ো সুপ্রিয়র রাতে ঘুম আসত না। দরজায় কাচে চোখ লাগিয়ে বসে থাকত কে কী করছে। গোপনে ক্যামেরায় আমার ঘরে রাজীবের ঢোকার আর বেরোনোর ছবি তুলেছিল। টাইম সমেত। তারপর মোটা টাকায় বেচেছিল মিডিয়াকে। স্ক্যান্ডাল তো একটা হলই। বর ডিভোর্স দিল। মেয়ে আজকাল আর আমার কাছে আসে না।'

ধৃতি দেখল রোশনির দুই গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে। 'কতক্ষণ আর এই কুকুরদের নিয়ে থাকতে ভালো লাগে বলো তো? রাজীব নিজেও স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়ে। ওরও বউ বাচ্চা আছে। ওকে কেউ বোঝায় আমিই নাকি পাবলিসিটির জন্য এটা করেছি। সেই থেকে হাতে কাজও নেই।' এবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন রোশনি। ধৃতি একটু ইতস্তত করে তাঁর হাতে হাত রাখল।

— শুধু কি আমার সর্বনাশ করেছে শয়তানটা? সাগ্নিকের যা ক্ষতি করেছে কী বলব। ওর ক্যারিয়ারও তো দায়িত্ব নিয়ে শেষ করেছিল ওই কুচুটে বুড়ো।

— কীভাবে?

— সেটা সাগ্নিক ভালো বলতে পারবে। আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তোমার সঙ্গে কথা বলে অনেকদিন পর একটু হালকা লাগছে। মাঝে মাঝে এসো, কেমন? মিষ্টি মেয়ে তুমি... নাম যেন কী বললে? কৃতি?

— না না, ধৃতি... আচ্ছা, সুপ্রিয়বাবু মারা গেলেন কীভাবে?

— শুনেছি তো ঘরে মই থেকে পিছলে পড়ে। এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। পাপের শাস্তি পেয়েছে। না হলে কোনদিন আমিই শয়তানটাকে খুন করতাম। আমায় দেখলেই গা জ্বালানো একটা হাসি দিত। মনে হত দৌড়ে গিয়ে গলাটা টিপে ধরি...

৪

— তুমিই ধৃতি? রোশনি তোমার কথা বলেছিল... বসো। চা খাবে? না অন্য কিছু?

— না, না, কিচ্ছু খাব না। জাস্ট কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।

— বলো, কী প্রশ্ন?

— রোশনিদির ঘরে সেদিন কথা হচ্ছিল। শুনলাম সুপ্রিয়বাবু ওঁর কী সর্বনাশ করেছেন। দিদি বললেন আপনারও নাকি ক্ষতি করেছেন উনি? কী ক্ষতি সেটাই...

— জেনে কী লাভ বলো তো? সে তো প্রায় বছর দেড়েক হয়ে গেল। তুমি কি আবার এই নিয়ে স্টোরি করবে? শুনলাম তুমি নাকি জার্নালিস্ট?

— আরে না, না। জাস্ট কৌতূহল। যার ফ্ল্যাটে আছি, সে লোকটা কেমন ছিল জানতে ইচ্ছে করল, তাই...

— শুয়োরের বাচ... পার্ডন মাই ল্যাংগুয়েজ। কিন্তু অত বড়ো অসভ্য লোক আমি লাইফে দেখিনি। মরাল ভ্যালুজ বলে কিস্যু ছিল না। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের সিনেমায় চান্স দেবে বলে ফ্ল্যাটে নিয়ে আসত। তারপর... বুঝতেই তো পারছ। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু অন্যের পিছনে কাঠি করাটা ওর একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছিল। রোশনির ব্যাপারটা তো জানোই। আমার সঙ্গে যা করেছিল সেটাও খুব নোংরামি। আমি প্রথম যখন এই কমপ্লেক্সে আসি, খুব ভালো ব্যবহার করত আমার সঙ্গে। মাঝে মাঝেই রাতে পার্টি হত। ওই দারুর পার্টি আর কি... একদিন নেশার ঘোরে একটা দারুণ প্লট ওকে বলে দিলাম। শুনে বলল কাউকে না বলতে। ও নাকি এই থেকে স্ক্রিপ্ট করবে। আমরা দুজন মিলে প্রোডিউসারকে ধরে ছবি বানাব। ও-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে। কিছুদিন পরে দেখি সেই প্লটে সিনেমা রিলিজ করে গেল। প্রোডিউসার ঠিক আছে, স্ক্রিপ্ট রাইটার ঠিক আছে। শুধু আমি বাদ। সিনেমা ব্লকবাস্টার হিট। 'চব্বিশে আষাঢ়” দেখেছ নিশ্চয়ই। ভেবে দ্যাখো। ওটা আমি করলে আমার লাইফ পুরো চেঞ্জ হয়ে যেত। শুনেছি এটা পাওয়ানোর জন্য সেই পরিচালক ওকে লাখ পাঁচেক টাকা উপরিও দিয়েছিল।

— কিন্তু এত টাকা দিয়ে করতেন কী?

— সে আমি কী করে বলব? খরচা ছিল নিশ্চয়ই কিছু...

— সুপ্রিয়বাবু মারা যাওয়াতে তাহলে...

— সত্যি বলব? হেবি খুশি হয়েছি। হাতে কাজ নেই। এই ফ্ল্যাটের ভাড়া কতদিন দিতে পারব জানি না। তবু এই একটাই খুশির খবর। বুড়োটা মরেছে। মাঝে মাঝেই দেখতাম সিঁড়ি বেয়ে নামছে। মনে হত দিই একটা ঠেলা...

৫

ধৃতি ঘরে এসে বড়ো এক কাপ কফি বানায়। ভাবতে বসে। সুপ্রিয় বসু বেঁচে থাকতেই প্রচুর শত্রু বানিয়েছিলেন। এঁদের যে কেউ তাঁকে খুন করতেই পারত। কিন্তু তা হল না। সুপ্রিয় মারা গেলেন বন্ধ ঘরে। ঘরাঞ্চি থেকে উলটে পড়ে। 'পিওর অ্যান্ড সিম্পল অ্যাক্সিডেন্ট'। পোস্টমর্টেমে খুনের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তাঁকে শেষ জীবিত দেখেছিল ওয়াচম্যান সুদীপ। এই সুদীপই কিছুদিন আগে তাকে সেই পোস্টকার্ড এনে দিয়েছিল।

কফির কাপ সাইড টেবিলে রেখে ধৃতি দরজা বন্ধ করে, পায়ে স্লিপার গলিয়ে নিচে নামল। মূল দরজার পাশেই একটা চেয়ারে সুদীপ বসে আছে। হাতে একটা বই। দেখে বেশ অবাক হল ধৃতি। ওয়াচম্যান যে পড়ুয়াও হয় তা তার আগে ধারণা ছিল না। ধৃতিকে আসতে দেখতে পায়নি সুদীপ। যখন দেখল, তখন চমকে উঠে দাঁড়াল। আঙুল বইয়ের পাতায় গোঁজা।

— কী বই পড়ছ সুদীপ?

— দূরবীন। শীর্ষেন্দুর।

— তুমি বই পড়তে ভালোবাস?

— ওই একটাই তো নেশা ম্যাডাম। ফেসবুক করি না, পাবজি খেলি না। বই পড়ি।

— তা বেশ। তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। ফাঁকা আছ?

— হ্যাঁ ম্যাডাম, বলুন।

— তুমি বসো। বসেই কথা বলো। দাঁড়াতে হবে না।

সুদীপ একটু ইতস্তত করে চেয়ারে বসল।

— তুমি সুপ্রিয় বসুকে চিনতে?

— আজ্ঞে আমি ওয়াচম্যান। হাউজিং-এর সবাইকেই চিনতে হয়।

— উনি যেদিন মারা যান, সেদিন তুমি আর কাজের মহিলা তাঁকে শেষ দেখেছিলে?

— কাজের মহিলা না। আমি দেখেছিলাম। সেদিনও ওঁর নামে একটা পোস্টকার্ড এসেছিল। দিতে গিয়ে দেখি কাজের মেয়ে কানন বেরিয়ে আসছে। আমায় বলল বাবু লাইব্রেরি রুমে বই গোছাচ্ছেন। আমি ঢুকলাম। দেখি সত্যিই তাই। আমি বললাম, এত উপরে উঠে বই সাজাচ্ছেন, মাথা ঘুরে গেলে তো মুশকিল। উনি বললেন কিচ্ছু হবে না। তারপর খানিক এদিক ওদিক কথা হল। আমি ওঁর টেবিলে পোস্টকার্ড রেখে দরজা টেনে চলে এলাম।

— দরজা বাইরে থেকে টানলে লক হয়ে যেত?

— হ্যাঁ, ইয়েল লক। পরদিন কানন এসে অনেক দরজা ধাক্কায়। দরজা খোলেনি। কানন আমাকে জানায়। আমি সোজা পুলিশে ফোন করি। তারপর তো আপনি জানেনই।

— তুমি বললে ওঁর সঙ্গে তোমার এদিক ওদিক কথা হত। কী কথা?

— আমি গ্র্যাজুয়েট। চাকরি পাইনি। তাই এই কাজ করছি। কিন্তু বই পড়তে ভালোবাসি। উনি আমাকে নানারকম বই দিতেন পড়তে। পড়া হলে অনেক সময় জানতে চাইতেন বই কেমন লাগল। এইরকম কথা আর কি...

— সেদিন কী নিয়ে কথা হচ্ছিল?

— সেদিন আমি বললাম, আমি আপনাকে হেল্প করব? উনি বললেন, তাহলে তোমার গেট দেখবে কে? বললাম, গোপাল আছে। আমরা তো দুজন থাকি। উনি বললেন, দরকার নেই। চলে আসছিলাম, এমন সময় বললেন, ঠিক আছে, নিচের বইয়ের ডাঁইটা একটু তুলে দাও। দিলাম। তারপর উনি বললেন, তুমি যাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমিও চলে এলাম।

— আচ্ছা এই পোস্টকার্ডের কেসটা কী বলো তো? আজকের দিনে কেউ পোস্টকার্ড লেখে?

— তা জানি না ম্যাডাম। মাসে চার-পাঁচবার এই চিঠি আসত। আমিও একবার স্যারকে বলেছি। উনি হেসে বলেছেন, লেখে লেখে। পুরোনো বন্ধুরা লেখে। আর কিছু বলেননি।

ঘরে এসে ধৃতি দেখল কফি ঠান্ডা জল হয়ে গেছে। সেটাকে মাইক্রোওভেনে রেখে তিরিশ সেকেন্ড টাইম দিয়ে চালিয়ে দিল। এই পোস্টকার্ড তাহলে এই প্রথম না। আরও আছে। কোথায়? পুলিশ যদি না নিয়ে থাকে (সেটার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ তদন্ত হয়নি বললেই চলে) তাহলে সেগুলো এখনও লাইব্রেরিতেই আছে। লাইব্রেরি রুমের দরজা খুলল ধৃতি। বইয়ের একটা সোঁদা গন্ধ ভেসে এল নাকে। রুমের সিলিং অবধি ঠাসা বই। মাটিতেও কিছু বই স্তূপ করে রাখা। ধৃতি এই ঘরে আগেও এসেছে। পছন্দমতো দু-একটা বই নিয়ে পড়তে। এক কোণে সেই কাঠের ঘরাঞ্চি। এটা থেকে পড়েই মারা গেছিলেন সুপ্রিয়। ধৃতির শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু বই না, তাকে খুঁজতে হবে সেই চিঠিগুলো, যেগুলো নিয়মিত পেতেন তিনি, আর উত্তরও দিতেন— এমনকি মারা যাবার পরও।

খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই বাদামি চামড়ায় মোড়া একটা অ্যালবাম পেল ধৃতি। কালো মোটা কাগজে আঠা দিয়ে লাগানো সেপিয়া টোনের ছবি। উপরে পাতলা সেলোফেন পেপার। বেশিরভাগই পুরোনো দিনের নায়ক নায়িকা বা পরিচালকের সঙ্গে ছবি। সত্যজিৎ রায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছবিটা দেখে অবাক হল ধৃতি। এ ছবি আগে দেখেনি। প্রতি ছবির নিচে কুশীলবদের নাম কাগজে লিখে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া। একটা ছবি দেখে দাঁড়িয়ে গেল ধৃতি। ধুতি পরা গোবেচারা মতো এক ভদ্রলোকের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বেলবটম প্যান্ট আর বুক খোলা জামা পরা যুবক সুপ্রিয়। পিছনে একটা সিনেমার সেট। নিচে লেখা, 'আমি আর অরবিন্দ— দূরের বলাকা ছবির সেটে'।

ধৃতির এক বন্ধু আছে স্যমন্তক। পুরোনো বাংলা ছবির এনসাইক্লোপিডিয়া। তাকেই ফোন লাগাল ধৃতি।

— হ্যালো স্যমন্তক, শোন না, একটা দরকারে ফোন করলাম।

— বুঝেছি। কারণ দরকার ছাড়া তুই কখনও ফোন করিস না। বল...

— বাজে কথা বলিস না। শোন না, তুই দূরের বলাকা সিনেমার ব্যাপারে জানিস?

— হ্যাঁ, সুপারহিট সিনেমা। রঞ্জিত মল্লিক ছিল। কেন?

— সেই সিনেমায় সুপ্রিয় বসু স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলেন?

— হ্যাঁ। তবে একা নয়। অরবিন্দ-সুপ্রিয় স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন।

— এই অরবিন্দ কে?

— আরে এই তো আসল মানুষ। সুপ্রিয় ড্যাশিপুশি ছিল। প্রোডিউসার ধরত। আর অরবিন্দ গুপ্ত লিখত। মুখচোরা মানুষ। কিন্তু ডায়লগ লিখত যখন তখন বাঘের বাচ্চা। বাংলার সেলিম-জাভেদ বলা হত এদের। আশির দশকের মাঝামাঝি অরবিন্দবাবুর কী একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে স্মৃতি চলে যায়। তারপর থেকে কোনও খবর নেই। মরে-টরে গেছে বোধহয়। কেন, তোর কী দরকার?

— না, আসলে সুপ্রিয়কে নিয়ে একটা স্টোরি ভাবছি। থ্যাঙ্ক ইউ রে...

অরবিন্দ মারা যায়নি। সে এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে। অন্তত তিনদিন আগেও ছিল। কিন্তু কোথায়? চিঠিগুলো না পেলে এর সমাধান হবে না। ধৃতি এবার পাগলের মতো খুঁজতে থাকল এদিক ওদিক। কোনও লাভ নেই। শেষে চোখ গেল তাকের একেবারে

মাথায়। সিলিং-এর কাছে একটা সুটকেস মতো কী দেখা যাচ্ছে!! দুরুদুরু বুকে কাঠের ঘরাঞ্চিটা দাঁড় করিয়ে মাথায় উঠল ধৃতি। ওপর থেকে নিচটা কত দূরে মনে হচ্ছে। এখান থেকে পড়লে সত্যিই আর রক্ষা নেই। হাত বাড়িয়ে পেল বাক্সটা। একটা কাঠের বাক্স। বেশ ভারী। অতিকষ্টে নামিয়ে আনল নিচে। তালা মারা নেই, তাই খোলার ঝামেলা হল না। খুলেই ধৃতি দেখতে পেল সে যা চাইছে, তা সব বান্ডিল বান্ডিল করে রাখা। রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা গোছা গোছা পোস্টকার্ড। সবচেয়ে নতুন যেটা মনে হল সেই বান্ডিলটা খুলে পড়তে শুরু করল ধৃতি। অরবিন্দবাবু কিস্তিতে কিস্তিতে একটা গল্প পাঠিয়েছেন। প্রতিটাটেই এরকম একটা না একটা গল্প লেখা। তবে এটা ধৃতি জানে। কিছুদিন আগে হলে দেখা 'বিষণ্ণ সকাল' সিনেমার গল্প। কিন্তু চিত্রনাট্যকার হিসেবে একজনেরই নাম ছিল। সুপ্রিয় বসু।

গোটা জটটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে ধৃতির সামনে। কুয়াশাটা স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমে। সুপ্রিয় বসু আসলে অরবিন্দ গুপ্তের প্লট চুরি করতেন। কিন্তু অরবিন্দ কিছু বলতেন না কেন? বরং শেষ চিঠিতে লিখেছেন উনি আনন্দিত! এরকম তো হবার কথা না। পোস্টকার্ডে ঢাকুরিয়ার ছাপ। ঠিকই ধরেছে। কাছাকাছি থেকেই আসত এই চিঠি। কিন্তু এই যুগে পোস্টকার্ড!! আচমকা একটা ডায়রিতে চোখ পড়ল ধৃতির। সুপ্রিয়র প্রতিবছরের আয় ব্যয়ের হিসেব। সেটা দেখতে গিয়েই চমক! প্রতি বছর প্রায় ছয় লাখ টাকা করে সুপ্রিয় দিতেন দি রিট্রিট নামে কোন এক সংস্থায়। সাগ্নিক চ্যাটার্জি বলেছিলেন সুপ্রিয়র টাকার দরকার থাকে সবসময়। এদেরকে দিতেই? কারা এরা? ধৃতি দ্রুত গুগল করল। কিছুটা আন্দাজ করেছিল। এবার শিওর হল। দ্য রিট্রিট এক মানসিক রোগীদের প্রাইভেট হোম। সবচেয়ে দামি আর পশ। ঢাকুরিয়ার কাছেই। ধৃতি বুঝল সে অরবিন্দ গুপ্তের ঠিকানা পেয়ে গেছে।

৭

হোমের চকচকে মেঝে পেরিয়ে রিসেপশনিস্টের কাছে যেতেই তিনি ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

— কী চাই?

ধৃতি আই কার্ড বার করল।

— আমি নিউজ চ্যানেল থেকে আসছি। আপনাদের এখানে বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার অরবিন্দ গুপ্ত ভরতি আছেন অনেকদিন হল। আমি ওঁকে নিয়ে একটা স্টোরি করতে চাই।

ভদ্রমহিলার মুখটা অদ্ভুত বেঁকে গেল।

— বাবা, এতদিন আছেন উনি। আজ অবধি কাউকে তো দেখা করতে দেখলাম না। আজ সোজা সাংবাদিক! খবর পেলেন কোথা থেকে?

— ওঁর এক আত্মীয় আমায় সেদিন বললেন।

শুনে ভদ্রমহিলা আরও চটে গেলেন।

— কে সেই আত্মীয়? আজ অবধি একদিন দেখা করতে আসেনি!! শুনুন, তাঁকে বলে দেবেন, সুপ্রিয় বসু এত বছর টাকা দিয়ে চালাচ্ছিলেন তাই উনি আছেন। সুপ্রিয়বাবুও তো মারা গেছেন মাসখানেক হল। এই বছরের টাকা সামনের মাসেই শেষ। তখন রিনিউ না

করলে আমাদের পক্ষে আর ওঁকে রাখা সম্ভব না। এই ফাইভ স্টার খাতির কোথায় পাবেন শুনি? সোজা সরকারি হোমে রেখে আসব।

ধৃতি বুঝল এঁকে চটালে চলবে না। হাসিমুখে বলল, 'অবশ্যই জানাব। অরবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

মহিলা গোমড়া মুখে 'মহুয়া, অ্যাই মহুয়া, এঁকে একটু অরবিন্দবাবুর কাছ নিয়ে যা তো' বলায় কোথা থেকে একটা ছোট্টখাট্ট মেয়ে এসে ধৃতিকে বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

এই মেয়েটি বেশ নরমসরম। ধৃতি যেতে যেতেই জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল ওঁর?'

— শুনেছি একটা অ্যাকসিডেন্টে মাথার ডানদিকে চোট পান। তারপর এখন অদ্ভুত অবস্থা। মনে মনে উনি এখনও আশির দশকেই আছেন। রাশিয়ার কথা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কথা বলেন, পোস্টকার্ডে চিঠি লেখেন...

— কাকে লেখেন?

— সুপ্রিয়বাবুকে। ওঁর বন্ধু। উনিই ওঁর এখানের খরচ দেন।

— কী লেখেন জানো?

— বলেন তো গল্প। কিন্তু টানা লিখতে পারেন না। অল্প অল্প করে লেখেন। আমি গিয়ে ডাকে ফেলে আসি।

— সুপ্রিয়বাবু আসতেন না?

— অনেকদিন আগে একবার এসেছিলেন। অরবিন্দবাবু চিনতে পারেননি... এই যে ওঁর ঘর...

বলে একটা ছোটো ঘর খুলে দিল মহুয়া। কাচের জানলা দিয়ে আলো ঢুকছে। ঘরে আসবাব বিশেষ কিছু নেই। একটা ছোটো বইয়ের আলমারি। একটা টেবিল, চেয়ার আর খাট। টেবিলে বসে বৃদ্ধ অরবিন্দ কী যেন লিখছেন। ধৃতি এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক তাকে খেয়াল করেননি। খুব নরম করে ধৃতি বলল, "ভালো আছেন অরবিন্দবাবু?"

চমকে উঠলেন তিনি, "আপনি? আপনি কে?"

— আমি ধৃতি। সুপ্রিয় বসুর নতুন সেক্রেটারি।

— ও বাবা, সুপ্রিয় সেক্রেটারিও রেখেছে! আজ কদিন ওর চিঠি পাই না। কী ব্যাপার?

— উনি একটু ব্যস্ত আজকাল। আপনাদের সিনেমা তো সব সুপারহিট!

হাসি ফুটল ভদ্রলোকের মুখে, "আমিও শুনি, জানো। খুব ইচ্ছে হয় দেখতে যেতে। কিন্তু এখানে কড়া নিয়ম। বেরোনো মানা। কটা হলে রিলিজ করেছে, কত টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে, সব আমায় বলে সুপ্রিয়। এবারে নাকি মিনার, বিজলী, ছবিঘর, তিনটেতেই হাউসফুল ছিল?"

— হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছেন। আচ্ছা অরবিন্দবাবু, সুপ্রিয়বাবুর শেষ চিঠিটা একটু দেখাবেন?

"এই এই তো... এই তো আমার পাশেই আছে", ধৃতির হাতে পোস্টকার্ড তুলে দিলেন অরবিন্দ গুপ্ত।

সিনেমা রিলিজের পরের দিনের চিঠি। হাতের লেখা সুপ্রিয়র কায়দায়। কিন্তু সুপ্রিয়র না। তাতে লেখা—

বন্ধু অরবিন্দ,

আমাদের যৌথ ছবি বিষণ্ণ সকাল সুপারহিট হয়েছে। এখন যে গল্পটা লিখছ সেটার শেষ অংশটা পাঠাও। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় আগ্রহ দেখিয়েছেন। তুমি শেষ অংশ পাঠালেই আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব।

ইতি

সুপ্রিয়

এখন প্রশ্ন একটাই। এ চিঠি কে লিখল? আর তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন... কেন?

ফিরে গেটে সুদীপকে দেখতে পেল না ধৃতি। গোপালের সঙ্গে নতুন একটা ছেলে বসে আছে। কী ব্যাপার? সুদীপ কি চাকরি ছেড়ে দিল? পড়াশুনো করা হাসিখুশি এই ওয়াচম্যানকে কখন যে বেশ পছন্দ করতে শুরু করেছিল ধৃতি, নিজেই জানে না।

— কী ব্যাপার গোপাল? সুদীপ কোথায়?

— চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ম্যাডাম।

— কেন?

— ওর এখন বিশাল ব্যাপার। পড়াশুনোতেতে বরাবরই ভালো। কী একটা গল্প লিখে সেদিন আমাদের ডিরেক্টর সাগ্নিকবাবুকে শুনিয়েছে। উনি তো শুনেই খুশ। দুজনে গেছিল শ্রী বালগোপাল ফিল্মস-এ। ওরা নাকি লাখ পাঁচেক দিয়ে গল্প কিনে নিয়েছে। ও গল্পে ছবি হবে। সুদীপ আর এই কাজ করবে না। সিনেমার কাজই করবে... লাইফ বদলে গেল ম্যাডাম ওর...

ধৃতি হেসে বলল, "বাহ রে! বেশ তো! ওকে অভিনন্দন জানাতে হবে। ওর বাড়ির ঠিকানাটা একটু দেবে? দরকার ছিল।"

উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি গলি। উবের ড্রাইভার বলল ঢুকবে না। একটু এগিয়ে গিয়ে দু-একজনকে জিজ্ঞেস করতেই বাড়ি দেখিয়ে দিল। পুরোনো প্রায় ভেঙে পড়া শরিকি বাড়ি। সুদীপ বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ধৃতিকে দেখে চমকে উঠল, "ম্যাডাম, আপনি? এখানে?"

— তোমার সুখবরটা পেলাম। গোপাল বলল। তাই মিষ্টি দিতে এলাম।

সুদীপের ঘোর যেন কাটেনি। আমতা আমতা করেই বলল, "আসুন ম্যাডাম। ভিতরে আসুন।"

ঘরের ভিতরটা অগোছালো। অবিবাহিত ছেলেদের যেমন হয় আর কি। খাটে বেশ কিছু বই রাখা। একটা বই খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। সেই খাটের এক কোনায় বসল ধৃতি। হাসিমুখে সুদীপের হাতে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "এবারে বলো, সুপ্রিয় বসুকে তুমি কেন খুন করলে?"

খানিকক্ষণ ধৃতির মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইল সুদীপ। চোয়াল শক্ত। গলার কাছটা দপদপ করছে। বেশ খানিক বাদে প্রায় ফিসফিসে গলায় বলল, "আপনাকে কে বলেছে?"

— কেউ না। আমিও কাউকে বলব না। জাস্ট কৌতূহল।

— আপনি বুঝলেন কী করে?

— যে-কোনো হত্যায় সন্দেহ সবার আগে তার ওপরেই পড়ে যে মৃত ব্যক্তিকে শেষ দেখেছে। মানে এই ক্ষেত্রে তুমি। কিন্তু মজাটা হল, আপাতদৃষ্টিতে তোমার কোনও মোটিভ নেই। তাই হু মিলে গেলেও হোয়াই-তে আটকে যাচ্ছিল বারবার। সুপ্রিয় বসু অসৎ মানুষ ছিলেন। অরবিন্দবাবুর মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁকে দিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে গল্প লেখাতেন আর সেই গল্প নিজের নামে চালাতেন। এ কথা কারও জানার কথা না, কারণ অরবিন্দবাবু তো ভাবছেন ছবিতে দুজনের নামই থাকছে। তাহলে এই পোস্টকার্ডের গল্পের কথা আর কে জানতে পারে? সেই লোক, যে এটা ঘরে পৌঁছে দেয়। বিশেষ করে সে যদি পড়ুয়া হয়, আর পড়ার বইয়ের অভাব থাকে তবে সে হাতের কাছে যা পায় পড়ে। আমার বিশ্বাস ঠিক এটাই তোমার সঙ্গে হয়েছিল। তুমি বুঝতে পেরেছিলে কেউ একজন চিঠিতে গল্পের প্লট লিখে পাঠাচ্ছে আর পোস্টকার্ড হওয়াতে পড়াও সুবিধে। সুপ্রিয়বাবু যেদিন মারা গেলেন, সেদিন তুমি তাঁর ঘরে চিঠি নিয়ে গেলে। তিনি তখন ঘরাঞ্চির মাথায়। আমি নিজে উঠে দেখেছি অত উপর থেকে পড়লে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। তুমি পোস্টকার্ড পড়ে বুঝেছিলে আর-একটা নতুন গল্প শেষ হতে চলেছে। হলেই সুপ্রিয় সেটাকে নিয়ে সিনেমা বানাবেন। দেখলে এই সুযোগ। ঘরাঞ্চিতে ঠেলা দিতেই সুপ্রিয় বসু মাটিতে ঘাড় মটকে পড়ে গেলেন। তুমি তাঁর নাড়ি দেখলে। তিনি মারা গেছেন। খুব সাবধানে ঘরাঞ্চি থেকে হাতের ছাপ মুছে তুমি দরজা লাগিয়ে বেরিয়ে এলে। এখন শুধু একটাই ফাঁক রয়ে গেল। গল্পের শেষটুকু তোমার জানতে হত। যদি ভুল না করি, সুপ্রিয় বসুর চিঠিও তুমিই ডাকে ফেলতে, জানতে হাতের লেখা কীরকম। হাতের লেখা নকল করে অরবিন্দকে চিঠি লিখলে। গল্প এল। তুমি গোটা গল্প বাড়িয়ে নিজের নামে সাগ্নিক চ্যাটার্জিকে শোনালে, যেমন সুপ্রিয় করতেন। আর তারপর... তোমার লাইফ বদলে গেল। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার একটু বলো দেখি। অরবিন্দবাবু যে মানসিক রোগী, হাতের লেখার বদল ধরতে পারবেন না, এই খবরটা তুমি পেলে কোথা থেকে?

— আমার প্রেমিকা। মহুয়া। ও রিট্রিটে কাজ করে। ও-ই আমাকে এই চিঠিগুলোর কথা প্রথম বলেছিল। কিন্তু আপনি যা বললেন তার অনেকটাই ভুল। আমি গল্পের লোভে খুন করিনি। ইনফ্যাক্ট আমি খুনই করিনি। কলেজে দারুণ লেখালেখি করতাম। ম্যাগাজিনের এডিটার-ও ছিলাম। তারপর বাবা মারা গেলেন। মা আগেই গেছিলেন। চাকরি নেই। উপায় না দেখে ওয়াচম্যানের কাজ নিলাম। ভালো লাগত না, জানেন। একদিন সুপ্রিয় স্যারের সঙ্গে আলাপ হল। চিঠি দিতে গিয়েই... বললাম আমিও লেখালেখি করি। উনি খুব উৎসাহ দেখালেন। আমি কলেজে ম্যাগাজিনের লেখা একটা গল্প পড়ালাম। বললেন বেড়ে হয়েছে। আমি বললাম, এ থেকে সিনেমা হয় না? উনি বললেন প্রযোজককে বলবেন। দুই হপ্তা বাদে জানালেন গল্প রিজেক্ট হয়েছে। ছয়মাস গেল না, গোপাল দেখি একটা ওয়েব সিরিজের গল্পের খুব প্রশংসা করছে। মোবাইলে দেখাল। চমকে উঠলাম। এ তো হুবহু আমার লেখা গল্প! কিচ্ছু বলিনি জানেন। ঘরে এসে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছি। যেদিন স্যার মারা গেলেন, সেদিন ওঁর ঘরে গেছিলাম চিঠি দিতে। ঘরাঞ্চির মাথায় উনি। নিচে আমি। খুব ইচ্ছে করছিল দিই ঠেলা। পারলাম না। ভদ্রঘরের

ছেলে তো! উনি বললেন বইয়ের ডাঁই তুলে দিতে। দিতে গিয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ঘরাঞ্চিতে। ঘরাঞ্চি কাত হয়ে গেল। উনি সোজা নিচে। যখন বুঝলাম মারা গেছেন, প্রথমে ভয় হল। তাড়াতাড়ি দরজা আটকে বেরিয়ে এলাম। সেদিন সারারাত ঘুমাতে পারিনি। পরে দেখলাম তেমন কোনও তদন্ত হল না। তখন এল লোভ। অরবিন্দবাবুর গল্পের পুরোটাই তো জানা। শুধু শেষটা জানতে বাকি। চিঠি লিখলাম সুপ্রিয় স্যারের হাতের লেখা নকল করে। বাকিটা তো আপনি জানেন। আচ্ছা, আপনি কি পুলিশে যাবেন?

ঘাড় নাড়ল ধৃতি, "না। শুধু একটাই প্রশ্ন। আমাকে চিঠিটা দিলে কেন? না দিলেও তো পারতে... তাহলে এত কিছু হতই না।"

— পিওনবুকে রিসিভ করে নিয়েছিলাম যে। দিতেই হত। আমাদের খাতায় চিঠি বা পার্সেল ডেসপ্যাচ করে রিসিভ করিয়ে নিতে হয়। একবার একটা পার্সেল খোয়া গেছিল। সেই থেকে। তবে ভেবেছিলাম আপনি রিসিভ করবেন না। করলেও পাত্তা দেবেন না। এত কিছু হয়ে যাবে বুঝতেই পারিনি। একটা কথা ম্যাডাম, আমার জীবন এতদিনে অন্যদিকে ঘুরছে। প্লিজ, প্লিজ, কাউকে কিছু বলবেন না।

৯

তিনদিন বাদে আবার রিট্রিটে গেল ধৃতি। সেই মহিলাই বসে আছেন রিসেপশানে। একটা এক লাখের চেক দিয়ে ধৃতি বলল, "এখন থেকে অরবিন্দবাবুর খরচা আমিই দেব। একটু ওঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে?"

এই প্রথম হাসি ফুটল মহিলার মুখে।

"মহুয়াকে ডাকতে হবে না। আমি চিনি", বলে পা বাড়াল ধৃতি।

আবার সেই ঘর। অরবিন্দ বসে আছেন চেয়ারে। ধৃতি হেসে বলল, "আমায় চিনতে পারছেন? সুপ্রিয়বাবুর সেক্রেটারি।"

— হ্যাঁ, হ্যাঁ... চেনা চেনা লাগছে

— আপনার আগের গল্প থেকে সিনেমা হচ্ছে। সত্যজিৎ বাবু রাজি হয়েছেন। এবার নতুন গল্প লিখতে হবে। মৃণাল সেন চেয়েছেন।

— বলেন কী! আমার গল্পের এত কদর!!

চকচক করে ওঠে অরবিন্দের মুখ। তাঁর সামনে একগোছা পোস্টকার্ড নামিয়ে রাখে ধৃতি।

"যেমন পাঠান, তেমনই পাঠাবেন। তবে একমাসের মধ্যে গল্প শেষ করতে হবে। ওঁদের একটু তাড়া আছে, কেমন?"

অরবিন্দর বোবা হাসির উত্তরে মৃদু হেসে ধৃতি দরজার দিকে এগোয়। অদ্ভুত এক প্রশান্তি তার সারা শরীর জুড়ে। রিট্রিট থেকে বেরিয়েই ফোন বার করে একটা নম্বর ডায়াল করল ধৃতি। বার দুই রিং হবার পর অপর পক্ষ ধরল।

"হ্যালো সাগ্নিকদা, আমি ধৃতি বলছি। হ্যাঁ। হাউজিং-এর ধৃতি। একটা দারুণ গল্পের প্লট মাথায় এসেছে। ভালো সিনেমা হবে... হ্যাঁ, আপনাকেই দেব। তবে আমায় একমাস সময় দিতে হবে..."

লেখকের জবানি : এটা অনেকদিন আগে সত্যি হয়েছিল। ডাক বিভাগের তৎপরতায় আমার এক আত্মীয়ের লেখা চিঠি আমাদের বাড়িতে তাঁর মৃত্যুর পরে পৌঁছায়। সেটাই মাথায় রেখে গল্পটা লেখা।

টেলিপ্যাথি

১

"এক্সকিউজ মি। একটু শুনবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ... আপনাকেই ডাকছি। আপনিই কুহু তো?"

পিছনে থেকে অচেনা গলার ডাক শুনে একটু চমকে পিছনে ফিরে তাকাল কুহু। এটা ওর ছোটো থেকে হয়। থেকে থেকেই চমকে চমকে ওঠে। এখনও নাকি ঘুমের ঘোরে কী সব বলে আর ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। ওর রুমমেট তৃষা বলছিল সেদিন।

মহাজাতি সদনে জাদুকর এ সি সরকারের শো সবে ভেঙেছে। দর্শকরা ধীর পায়ে বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছে। তাদের অনেকেই আবার ঘাড় ঘুরিয়ে কুহুকে দেখছে। কুহু জানে এর কারণ কী।

জাদুখেলার শেষ আইটেম ছিল হিপনোটিজম বা সম্মোহন। জাদুকর দেশি ও বিদেশি সম্মোহন নিয়ে নানা কথা বললেন। বললেন আন্টন মেসমার আর মেসমারিজমের কথা। তারপর আচমকা মঞ্চে ডেকে নিলেন কুহুকে। ব্যাপারটার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না কুহু। এই অনুষ্ঠানে তার আসারই কথা না। তৃষাকে আজই সাততাড়াতাড়ি দেশের বাড়ি পুরুলিয়ায় যেতে হল। ওর বাবার একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক মতো হয়েছে। যাওয়ার আগে কুহুকে আগাম কেটে রাখা টিকিটটা দিয়ে গেছে। নইলে বেকার নষ্ট হত। কুহুরও আজকে টিউশানি পড়ানো নেই। মেসে বসে থেকেই বা কী করবে ভেবে একা একা ম্যাজিক দেখতে এসেছিল। এসে এই কাণ্ড!

প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত গুটিগুটি পায়ে মঞ্চে উঠে আসে কুহু। জাদুকর তার নাম জিজ্ঞেস করলেন।

"কুহু মুখার্জি।"

"কী করা হয়?"

"এই কলকাতাতেই একটা স্কুলে পড়াই।"

"বাঃ কুহু! আপনি তাহলে দিদিমণি! কিন্তু দিদিমণি, এখন তো কিছুক্ষণ আপনাকে ছাত্রী হতে হবে। নিন এই চেয়ারে চুপটি করে বসুন", জাদুকরের ঠোঁটে দুষ্টুমি মাখা হাসি।

কুহু বাধ্য মেয়ের মতো চেয়ারে বসে পড়ল। জাদুকর যেন হাওয়ায় হাতড়ে একটা পেন্ডুলাম হাজির করলেন।

"এবার আমি পেন্ডুলাম দুলিয়ে তিন গুনব। এক-দুই-তিন বললেই আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। মন দিয়ে তাকিয়ে থাকুন এই পেন্ডুলামের দিকে। এ-এ-ক, দু-ই-ই, তিন..."

বলামাত্র কুহুর মনে হল আশেপাশের সমস্ত আওয়াজ এক ঝটকায় কমে গেল। ঠিক যেন টিভির মিউট বাটন টিপে দিয়েছে কেউ। সে জেগে আছে। কিন্তু কানে অদ্ভুত একটা গোঁ গোঁ শব্দ। পরিষ্কার একমাত্র জাদুকরের গলা।

"আমাদের কুহু দিদিমণি এখন সম্পূর্ণ সম্মোহিত। ওঁকে যা করতে বলব, একটিও প্রশ্ন না করে তিনি সেটাই করবেন। এমনকি মানুষ খুনও... হা হা হা... না, না, এত কঠিন

কাজ দেব না ওঁকে। উনি বরং এই তুলোর বলটা আপেল ভেবে মুখে নিয়ে চিবুতে থাকুন।”

বলেই কুহুর হাতে লাল রঙের একটা তুলোর ডেলা গুঁজে দিলেন জাদুকর। কুহু স্পষ্ট বুঝতে পারছিল এ জিনিস চিবানো মানে লোক হাসানো ছাড়া কিছু নয়। সে কিছুতেই এই কাজ করবে না। কিন্তু সে নিজেই অবাক হয়ে দেখল তার ইচ্ছের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তার হাত ধীরে ধীরে মুখের কাছে উঠে এসে তুলে ধরল সেই বলটা। আর মুখও বশংবদের মতো সেই বলে কামড় লাগাল।

দর্শক আসনে ওঠা হাসির ফোয়ারা খুব মৃদু হলেও এল কুহুর কানে। সে বহুবার চাইল বলটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে। পারল না। পরের দশ মিনিট কুহু স্টেজে হামাগুড়ি দিল, কাল্পনিক এক কুকুরছানার মাথায় হাত বোলাল, নিজের হাতের হ্যান্ডব্যাগটা ধরে গদার মতো চালাল এবং সবটাই নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তার সব অঙ্গগুলো যেন বেজায় অভব্য হয়ে তার কথা শুনতে অস্বীকার করছে। চলছে সেই জাদুকরের নির্দেশে। কুহু বুঝতে পারছিল সে কী করছে। কিন্তু না করেও থাকতে পারছিল না। অপমানে তার সারা গা রি রি করছিল। যদি এই ম্যাজিশিয়ানটাকে বাগে পাওয়া যেত...

প্রায় পনেরো মিনিট কসরতের পর জাদুকর কুহুর দুই চোখের মাঝে আঙুল ছুঁয়ে তার সম্মোহন কাটালেন। দর্শকদের করতালিতে তখন হলে পায়রা উড়ছে। কুহুর কাছে ক্ষমা চেয়ে দর্শকদের প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে জাদুকর শো শেষ করলেন। কুহুর চোখে হালকা কান্নার আভাস। বেরোবার পথেই সেই পিছুডাক, “এক্সকিউজ মি...!”

কুহু পিছন ফিরতেই দেখল বেঁটে, মোটা, কালো, চশমা চোখে হাসিমুখ এক ভদ্রলোক দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন আর ডান হাত তুলে তাঁকে দাঁড়াতে বলছেন। কুহুর সামনে এসে ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন “একটু সময় হবে কুহু দেবী? আপনার সঙ্গে জরুরি কথা ছিল।”

ভদ্রলোক কুহুর নাম কী করে জানলেন তা বোঝার জন্য বুদ্ধি লাগে না। জাদুকরের কল্যাণে হলের সবাই তা জেনেছে। প্রশ্ন হল, কী এমন জরুরি কথা!

“বলুন।”

“আচ্ছা আপনি কি তুলা রাশি?”

আচমকা এই প্রশ্নে বেশ অবাক হল কুহু। প্রথমত, এত ডেকে হেঁকে শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্ন! আর দ্বিতীয়ত, সে সত্যিই তুলা রাশি।

“কেন বলুন তো?”

“আপনি তুলা রাশি, তাই তো? আমিও তাই। আপনাকে যখন জাদুকর সম্মোহিত করছিলেন তখনই বুঝেছি। তুলা রাশির জাতকদের মনে প্রভাব বিস্তার করা সবচেয়ে সহজ। দেখেন না, প্ল্যানচেটে যত বড়ো বড়ো মিডিয়াম, মাদাম ব্লাভাটস্কি থেকে মাদাম কোনান ডয়েল, সবাই তুলা রাশির মহিলা।”

কুহু এবার সত্যিই বিরক্ত হল। রাত্রি হয়েছে। রাস্তার লোকজন কমছে। আর এই ভদ্রলোক তার পথ আটকে কি আবোলতাবোল বকে চলেছেন!

“আবোলতাবোল না ম্যাডাম!” কুহুর মনে কথা ধরতে পারছে লোকটা, এমনভাবে বলল, “জানেন তো আজকে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।”

"কী ঘটনা?" কুহুর কৌতূহল বাড়ছে।

"জাদুকর আপনাকে সম্মোহিত করা মাত্র আপনার মন তো আর আপনার বশে রইল না। ঠিক তখনই আমি অনুভব করলাম আপনার মনের সব কথা আমি পড়তে পারছি। স্টেজে উঠে আপনার বিরক্তি, রাগ, কেন স্টেজে উঠলাম এমন ভাবা, কান্না... সব।"

"এ আর নতুন কী? এমন অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনেকেরই হয়। আপনারও হয়েছে।"

এবার ভদ্রলোক গলাটা খাদে নামিয়ে মুখটা কুহুর কানের কাছে নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, "আর এক মুহূর্তের জন্য জাদুকরকে যে আপনার খুন করতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেটাও কি সবার হয়? হয় না তো?"

কুহু চমকে উঠল। মুখে কিছু বলল না। ভদ্রলোকের গলা এবার প্রায় সাপের মতো হিসহিসে হয়ে গেছে। পোস্টের আলোতে তাঁর চশমার মাইনাস পাওয়ারের মোটা কাচ চিকচিক করছে। হাসি হাসি মুখে তিনি আবার শুরু করলেন, "আপনি বুঝতে পারছেন না কেন কুহু দেবী? একেই ইংরাজিতে টেলিপ্যাথি বলে। আজ থেকে আপনার আর আমার মনের যোগ হয়ে গেল। এতে আপনারও কিছু করার নেই। আমারও না। আর হ্যাঁ, নামটা মনে রাখবেন, মলয় সামন্ত। আজ চলি, কেমন?"

২

মলায় সামন্তকে প্রায় ভুলেই গেছিল কুহু। ডুবে গেছিল স্কুল, টিউশানি আর মেসে ফিরে রান্নাবান্নায়। কিন্তু বেশিদিন ভুলে থাকতে পারল না। সেদিন স্কুলে পরীক্ষা চলছে। হলে গার্ড দিয়ে গিয়ে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল কুহুর। হঠাৎ তার মনে হল সে আর ক্লাসরুমে নেই। বরং দাঁড়িয়ে আছে কোনও পাঁচতারা হোটেলের বিরাট লাউঞ্জে। প্রচুর সুসজ্জিত নারী ও পুরুষ। কোনও পার্টি চলছে সম্ভবত। না চাইলেও বারবার তার চোখ চলে যাচ্ছে মুসুর রঙের মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি পরা দারুণ দেখতে এক মহিলার দিকে। মহিলার হাতে পানীয়ের গেলাস। কথা বলতে বলতে বারবার ঢলে পড়ছেন পাশের ভদ্রলোকের গায়ে। শাড়ির আঁচল সরে যাচ্ছে বুক থেকে। মহিলাকে চেনা চেনা ঠেকল কুহুর। কোথায় যেন দেখেছে।

কিন্তু কী অবাক কাণ্ড! আজ এঁকে যতবার দেখছে তত রাগ হচ্ছে কুহুর। কেন? ইনি তো কুহুর কোনও ক্ষতি করেননি! তবু রাগটা ফিরে ফিরে আসছে। মহিলা হাত নেড়ে কাকে যেন ডাকলেন। আর তখনই কুহু তাঁকে চিনতে পারল। সেদিন মহাজাতি সদনে মলয় সামন্ত যখন তার সঙ্গে কথা বলছিল, একটু দূরেই বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই মহিলা। একবার হাত নেড়ে মলয়কে ডেকেছিলেন। ঠিক এইভাবে। তবে কি ইনি মলয়বাবুর স্ত্রী?

"ম্যাডাম, একটা পেজ প্লিজ", এক ছাত্রীর ডাকে সংবিৎ ফিরল কুহুর। তার গা হাত পা থরথর করে কাঁপছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কুহু বুঝতে পারল সে ধীরে ধীরে চারিয়ে বসছে মলয় সামন্তের মগজে। মলয় সামন্তের মগজ দখল নিচ্ছে তারটার। সেদিন যেমন মাঝরাতে হঠাৎ চমকে জেগে উঠে বসল কুহু। দেখল বিশাল এক খাটে সেই মহিলা নাইট গাউন পরে শুয়ে আছেন। শ্বাস বইছে মৃদু মৃদু। অঘোরে ঘুমিয়ে। মহিলাকে দেখেই তাঁর গলা টিপে ধরার এক অদম্য ইচ্ছে হতে লাগল কুহুর মনে। কতক্ষণ এভাবে চলল সে জানে না। আচমকা মাথার মধ্যে শুনতে পেল খুব চেনা মৃদু কিন্তু স্পষ্ট হিসহিসে এক কণ্ঠস্বর, "এ কী কুহু! এত রাতে তুমি জেগে আছ?"

৩

সেদিন তৃষার জন্মদিন ছিল। সন্ধেবেলা সে আর তৃষা মিলে কিছু বন্ধুর সঙ্গে শপিং মলে ঘোরাঘুরি করে রাতে রেস্তোরাঁতে খাবার কথা। রুমে এসে কুহু দেখল তৃষা বেরিয়ে গেছে। সেরকমই কথা ছিল। কুহু স্কুল থেকে মেসে ফিরে তৈরি হয়ে সোজা চলে যাবে সাউথ সিটিতে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে কুহু চুল আঁচড়াচ্ছে, এমন সময় আবার সব কিছু গুলিয়ে গেল। কুহু দেখল সে চলে এসেছে অভিজাত ঘরের এক বেডরুমে। এই রুমটাই সেদিন রাতে দেখেছিল। কিন্তু এবার দৃশ্য অন্য। জানলার ধারে পানীয়ের গেলাস হাতে বসে আছেন সেই মহিলা। পরনে সেই নাইট গাউনটাই। কুহুর মনে হল সে এগিয়ে যাচ্ছে। জানলার স্লাইডিং কাচ খোলা। দূরে কলকাতা শহরের স্কাইলাইন দেখা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা নেশাতুর চোখে কুহুর দিকে তাকালেন। অস্ফুটে প্রশ্ন করলেন, "আরে এই সময় তুমি? কী ব্যাপার!"

কুহু উত্তর দিতে চাইল। পারল না। সেই জাদুকরের সম্মোহনের দিনের মতো। দেখল একটা হাত বিদ্যুৎবেগে উঠে এসে চকিতে জানলার ধারে বসা সেই মহিলাকে মারল এক ধাক্কা। মহিলার তীব্র চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেয়ে কুহু দেখল সে তার নিজের ঘরেই বসে আছে। তার যা দেখার সে দেখে নিয়েছে। উদ্যত সেই ডানহাতের রোলেক্স ঘড়িটা তার চেনা। কিছুদিন আগেই মহাজাতি সদনে মলয় সামন্তের হাতে এই ঘড়িটাই দেখেছিল সে। তার চোখের সামনে মলয় সামন্ত তার স্ত্রীকে খুন করল। কোনও সাক্ষী নেই। সে ছাড়া। কিন্তু তার সাক্ষ্য কি আদালতে গৃহীত হবে!

তৃষাকে ফোন করে সে জানিয়ে দিল রাতে ডিনারে যেতে পারছে না, মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে। পরদিন সকালে আনন্দবাজারে পাঁচের পাতার ওপরের দিকেই বেশ বড়ো করে খবরটা ছাপা, "বিখ্যাত শিল্পপতি সঞ্জীব ব্যানার্জির একমাত্র মেয়ে সুমিতার মৃত্যু।" বিবাহসূত্রে সুমিতা ছিলেন ব্যবসায়ী মলয় সামন্তের স্ত্রী। তাঁদের মধ্যে কোনও দিন বনিবনার অভাব ছিল বলে জানা যায়নি। সঞ্জীব নিজের জামাইকে স্নেহই করতেন। খুব সম্ভব কোনও অজ্ঞাত কারণে ডিপ্রেশানে ভুগছিলেন সুমিতা। তাই জানলা থেকে ঝাঁপিয়ে সুমিতা আত্মহত্যা করেন। পেটে অনেকটা অ্যালকোহল পাওয়া গেছে। অবশ্য দুর্ঘটনার তত্ত্বকেও পুলিশ উড়িয়ে দিচ্ছে না। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ যাঁর উপরে পড়ে, সেই মলয়বাবু সেই সময় তাঁর গড়িয়ার ফ্ল্যাট থেকে বহুদূরে খিদিরপুরে ব্যবসার কাজে গেছিলেন। অন্তত চার-পাঁচজন সাক্ষী তেমনই জানাচ্ছে। খবরটা পড়ে আবার শিউরে উঠল কুহু। আর কেউ জানুক না জানুক, কুহু জানে, সেদিন সন্ধ্যায় মলয় সামন্ত তার ফ্ল্যাটে এসেছিল। হঠাৎ মাথাটা আবার টিপ টিপ করতে লাগল। অপর প্রান্তের কথাগুলো এবার আরও স্পষ্ট, আরও কাটা কাটা।

"কুহু, আমি জানি... তুমি স-ব জানো। কিন্তু তুমি যা জানো, সে তো আমিও জানি। সুতরাং সাবধান। তোমার প্রতিটা ভাবনার খবর আমার কাছে আসে। টেলিপ্যাথি... তোমাকে বলেছিলাম না!"

৪

দুইদিন কুহু যেন এক ঘোরের মধ্যে কাটাল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে তার মাথার মধ্যে যেন কে একটা বাসা বেঁধে চেপে বসে আছে। চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি করছে তার ওপরে।

মাঝেমধ্যেই ভেসে ভেসে আসছে সেই খুনের দৃশ্য। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। এখন সে জানে ঠিক কীভাবে খিদিরপুরের অফিসের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া করে চুপচাপ ফ্ল্যাটের ফায়ার একজিট দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে স্ত্রীকে খুন করেছিল মলয়। এরপর অন্য ট্যাক্সি ধরে ফিরে গেছিল।

কোনও সাক্ষী নেই, তবে কুহু জানে সেই দুটো ট্যাক্সির নম্বর, যারা মলয়কে নিয়ে যাতায়াত করেছিল। পুলিশ সেই ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করলেই সব কিছুর হদিশ পাবে। কিন্তু পুলিশকে সেই খবর দেবে কে? কুহু? সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যাবে মলয় সামন্ত। যে একটা খুন নির্বিকারে করতে পারে, আরও একটা করতে তার হাত কাঁপবে না।

কুহুর মাথার মধ্যে সেই ফিসফিসানি আরও বেড়েছে, "আমি বুঝতে পেরেছি তুমি পুলিশকে খবর দিতে চাও। কোনও লাভ নেই... আমার পয়সা আছে... পুলিশের মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা আছে। সুমিতা বড়ো বাড় বেড়েছিল। ওকে পৃথিবী থেকে সরতেই হত। আমার আড়ালে আমার পার্টনারের সঙ্গে প্রেম করত শয়তানীটা। ভেবেছিল আমি বুঝতে পারব না। তুমি এর মধ্যে ঢুকো না... মাঝখান থেকে তুমি কচি বয়সে প্রাণটা হারাবে দিদিমণি।"

বন্ধু তৃষার কিছু একটা সন্দেহ হচ্ছিল গোড়া থেকেই।

"তোর কী হয়েছে বল তো?" বারবার জিজ্ঞাসা করে সে। কুহু জবাব দিতে পারে না। পাঁচদিন এইভাবে কাটানোর পর সে ঠিক করল যা হবার হবে। সে পুলিশকে জানাবেই। কিন্তু পুলিশ স্টেশনে যে মলয় সামন্তের লোক বসে নেই তার কী নিশ্চয়তা! সুমিতার কোনও সন্তান ছিল না। একমাত্র ওয়ারিশ মলয়। তার হাতে এখন প্রচুর সম্পত্তি। পয়সার জোরে সে যা খুশি করতে পারে।

অনেক ভেবে একটা উপায় বের হল। কুহুর স্কুলের সহকর্মী রাজীবের কাকা যেন কোথাকার ডি.এস.পি। রাজীবকে তো তাহলে গোটা ঘটনা খুলে বলতে হয়। এদিকে মাথার সেই ফিসফিসানি ক্রমাগত বলছে, "বোকামি কোরো না কুহু। তুমি পুলিশ স্টেশন অবধি যেতেই পারবে না। রাজীবকে বললে আমি ওকে ছেড়ে দেব ভেবেছ? মাঝখান থেকে তোমার এই বোকামিতে ও বেচারাও মারা পড়বে।"

শেষে কুহু ঠিক করল সব কথা একটা চিঠিতে লিখে নিজের মেসের ঠিকানায় পাঠাবে। সে ফাঁকে নিজেও পালাবে। কোথায়? জানা নেই। জানতে চায়ও না কুহু। জানলেই তো মলয় সামন্ত জেনে যাবে। গোটা ঘটনা একটা চিঠিতে লিখে দুটো ট্যাক্সির নম্বরসুদ্ধু কুহু পোস্ট করে দিল তৃষার নামে। এবার খুব তাড়াতাড়ি পালাতে হবে তাকে। মলয় নিশ্চয়ই এই চিঠির কথা জেনে গেছে।

স্কুল থেকে মেসে ফিরেই সে বুঝল কেউ তাকে ধরতে এই মেসে আসছে। মোবাইলে মলয় কাউকে একটা নির্দেশ দিচ্ছে। তার নাম রহমত। কুহু বুঝল এক্ষুনি না পালাতে পারলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। শুধুমাত্র পার্সে এটিএম আর কিছু খুচরো নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সে। সামনেই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি, হাত দেখাতেই দাঁড়াল। কী সৌভাগ্য! কোনওক্রমে উঠেই গাড়ির দরজা সশব্দে বন্ধ করল কুহু।

"কাঁহা যাইয়েগা?" শুধাল পাঞ্জাবি ড্রাইভার।

"যাঁহা মর্জি লে চলিয়ে। সির্ফ মুঝে মত বতাইয়ে কাঁহা লে যা রহে হ্যায়।"

সর্দারজি এমন আজব যাত্রী আগে দেখেননি। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে "যো মর্জি" বলে তিনি গাড়ি ছোটালেন। পিছনের সিটে দুচোখ বন্ধ করে মাথা চেপে কুহু বসে রইল। সে দেখতে চায় না কোথায় যাচ্ছে, দেখলেই তো সে খবর পৌঁছে যাবে মলয় সামন্তের মস্তিষ্কে। তা হলেই সর্বনাশ!

কুহু বুঝল রহমত তার মেসের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েছে কারও তোয়াক্কা না করে। মলয় কথা বলছে তার সঙ্গে।

"কী বলছ? পাখি হাওয়া? ও আচ্ছা। ঠিক আছে। আমি দেখছি কী করা যায়।"

খানিক বাদে কুহুর মাথায় সেই গলা। যে হেসে হেসে বলছে, "কুহু... মিষ্টি মেয়ে আমার... কোথায় তুমি? ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না/ সত্যি বলছি কুস্তি করে তোমার সঙ্গে পারব না... বলো তো মামণি, তুমি কোথায়?"

যন্ত্রণায় কুহুর মাথায় যেন বড়োসড়ো একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। তবু সে জোর করে চোখ বুজে রইল। জানলা দিয়ে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস জানিয়ে দিল সে নদীর খুব কাছে এসে গেছে। কিন্তু না। সেটাও কুহু জানতে চায় না।

সর্দারজি গাড়ি থামালেন। তারপর ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, "আভি তো গঙ্গা মাইয়া এসে গেলেন। এবার বোলেন কুথায় যাবেন?"

কুহু তাকিয়ে দেখল আলোআঁধারি এক গলির মুখে গাড়ি দাঁড়িয়ে। এ জায়গা সে চেনে না। এক হিসেবে ভালোই হল। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে সোজা হাঁটা লাগাল কুহু। আজ রাতটা কোনওক্রমে কাটলে হয়। মলয় সামন্ত তাকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর কাল ভোর হলে সে কী করবে? সেটা কালকেই দেখা যাবে।

রাত হয়েছে। লোকজন কম। সামনে নিকষ কালো আঁধার। কিন্তু এ কী! অন্ধকার যে ধীরে ধীরে অবয়ব নিচ্ছে! তাও কুহুর চেনা অবয়ব। বিশালাকৃতি এগুলো কি তবে... কুহু চমকে উঠল। এ জায়গা তার একেবারেই অচেনা না। ছোটোবেলায় কলকাতা এলেই জাহাজ দেখার নাম করে বহুবার সে বাবার সঙ্গে এসেছে এই খিদিরপুর ডকে। এদিকে ডকটায় এখন কাজ হচ্ছে না। লোকজনের ভিড় একদম নেই। শুধু দু-একটা আলো জ্বলছে মিটমিট করে।

মাথার মধ্যে চারিয়ে উঠল একটা খিলখিলে হাসি, "এত দৌড়ঝাঁপ করে শেষে বাঘের গুহাতেই পা দিলে কুহু দেবী? আমি এক্ষুনি আসছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।"

কুহু বুঝল সে মলয় সামন্তের অফিসের খুব কাছেই আছে। হয়তো ঢিল ছোড়া দূরত্বে। এটাও বুঝল মলয় একটা গাড়ি স্টার্ট দিল। সে কুহুকে গাড়ির তলায় পিষে মারতে চায়। প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে শুরু করল কুহু। নদীর পাড় ধরে। পাশে ফেলে রাখা দড়িদড়াতে পা আটকে যাচ্ছে, তবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সে। একটা হলুদ আলো পিছন দিক থেকে এগিয়ে আসছে। উজ্জ্বল হলুদ চোখের মতো। ওই গাড়িতেই মলয় সামন্ত আছে। হাতে রোলেক্স ঘড়ি। চোখে হাই পাওয়ার চশমা। মুখে অদ্ভুত হাসি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

মলয়ের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হচ্ছে। গাড়ি ক্রমাগত এগিয়ে আসছে কুহুর দিকে। মলয় যেন তার গোটা মাথা অধিকার করে বসে আছে। এবার আর বাঁচার পথ নেই।

কুহু মনেপ্রাণে চাইছিল যদি কোনও মানুষের দেখা মেলে। সামনেই একটা ব্রিজ। ব্রিজ পেরোলে যদি সাহায্য মেলে। ব্রিজ ধরে খানিক দৌড়াতেই কুহুর পা বাতাস ছুঁল। কিছু বোঝার আগেই সে পেল কালো শীতল জলের স্পর্শ। ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রায় একশো

কিলোমিটার বেগে তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসে জলে পড়ল একটা কালো সিডান গাড়ি। কুহু টের পেল গাড়ির ভিতর মলয় সামন্তের সিটবেল্ট আটকে গেছে। সে বারবার চেষ্টা করছে খোলার। কিছুতেই পারছে না। মলয়ের ফুসফুস ধীরে ধীরে জলে ভরে উঠছে। একবার যেন বলেও উঠল, "কুহু... বাঁচাও।"

তারপর তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। কুহুর মাথায় আর কোনও ফিসফিসানি নেই। যেন চরম কোলাহলের পর শ্মশানের নিস্তব্ধতা। একটু দূরে গাড়ির পিছনের লাল আলোটা ডুবতে ডুবতে চোখের আড়ালে চলে গেল।

সাঁতরে পাড়ে উঠল কুহু। অন্ধকারে যেটাকে ব্রিজ ভেবেছিল আসলে সেটা জাহাজ থামার একটা ভাঙা জেটি মাত্র। মলয় সামন্ত বড্ড বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছিল কুহুর মাথার ওপর। সেও আর ভেবে দেখেনি। নিজের অজান্তেই কুহুর ভাবনা তারও ভাবনা হয়ে উঠেছিল। বাস্তবে ফিরে আবার শিউরে উঠল কুহু। শুধু টেলিপ্যাথির জোরে সে আস্ত একটা মানুষ খুন করে ফেলেছে।

লেখকের জবানি : ম্যাজিক নিয়ে পড়তে গিয়ে টেলিপ্যাথির কথা জানতে পারি। তখনই মনে হয়, কেমন হবে যদি দুজনের একজন কোনও অপরাধ করে, আর অন্যজন সেটা জানতে পেরে যায়? কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত এই গল্পটা আমার কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প।

পিপহোল

১

আজ সারাদিন খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। থামতেই চাইছে না। আকাশ থেকে ঘড়া ঘড়া জল যেন কেউ ঢেলে দিচ্ছে, আর তা পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে মোটা ধারায় বয়ে চলেছে লালচে নদী তৈরি করে। বাংলোর সবুজ চালে বৃষ্টিফোঁটার আওয়াজে কান পাতা দায়। দূরে দুরপিনদারা মনাস্ট্রি থেকে ভেসে আসছে আবছা ঘণ্টা আর শিঙার শব্দ।

জোরে একটা কান ফাটানো বাজ পড়তেই মারিয়া বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে অল্প একটু আকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধ্যা হতে খুব বেশি দেরি নেই। নিশ্চয়ই অন্য ঘরগুলোতে চাকররা এতক্ষণে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। তার ঘরে কেউ আলো জ্বালায় না। ফায়ারপ্লেসে রেখে দেয় না জ্বলন্ত কাঠ। ঘরের এককোণে একটা লোহার চারপেয়ে বিছানা। তলায় বেডপ্যান।

একবার নিজের আঙুলগুলোর দিকে তাকাল মারিয়া। রক্তাক্ত। ক্ষতবিক্ষত। সারাদিন কাঠের দেওয়ালে নখ ঘষে ঘষে কত কী লেখে মারিয়া। ওর সে ভাষা কেউ বোঝে না। মারিয়ার চুল উশকোখুশকো। গায়ে পুরু ময়লা। কতদিন কেউ ওকে গরম জলে চান করায় না। বন্ধ দরজার সামনে পড়ে আছে আধখাওয়া রুটি আর কাচের গেলাসে জলের তলানি। মারিয়া এগোতে চায়। পায়ে বাঁধা শিকলে ঝনঝন আওয়াজ হয়। কিছুটা এগিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে মারিয়া। তবু কোনওক্রমে শরীর হিঁচড়ে দরজার সামনে যেতে চায়। দরজার বাইরে কারা দাঁড়িয়ে আছে? কথা বলছে। মারিয়া কান পেতে শুনতে থাকে। অচেনা গলা। ওরা বলছে মারিয়াকে কোথায় যেন নিয়ে যাবে। কোথায়? মারিয়া কোথাও যাবে না। সে এই ঘরেই থাকবে।

আর-একবার জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই শিকল ছিঁড়ে গেল। মারিয়া কোনওক্রমে দৌড়ে চলে এল দরজার একদম পাশে। কান ঠেকাল দরজায়। ওরা দুষ্টু লোক। ওরা ওর মাকে মেরেছে। এবার ওকে মারতে এসেছে। বাইরের তালা খোলার আওয়াজ পেয়েই এক ঝটকায় ঘরের ভিতরের খিলটা লাগিয়ে দেয় সে। দরজায় ধাক্কার শব্দ। একবার। দুবার। বারবার। মারিয়া কিছুতেই দরজা খুলবে না। মারিয়া নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। অপেক্ষা করে ওদের চলে যাওয়ার। তারপর গলা ফাটিয়ে চিলচিৎকার করে ওঠে...

২

ঘরটা দেখেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মৌসুমী। ঠিক এরকমটাই চাইছিল সে মনে মনে। প্রায় হপ্তাখানেক ধরে ঘর খোঁজা চলছে। কোনোটাই ঠিক মনের মতন হচ্ছে না। এদিকে সারাজীবন কলকাতায় কাটিয়ে এখন কালিম্পং-এ প্রথমবার এসে ঘর খোঁজাও ঝকমারি। সবচেয়ে বড়ো হল ভাষার সমস্যা, এখানের স্থানীয় মানুষরা নেপালি ভাষাতেই স্বচ্ছন্দ। হিন্দিও চলে। এদিকে সে বাংলা আর ইংরাজি বাদে কিচ্ছুটি জানে না। ভাগ্যিস সঙ্গে নিধি ছিল। নিধি মহারাষ্ট্রের মেয়ে। দারুণ হিন্দি বলে। বাংলাও। কলকাতাতেই বড়ো হয়েছে। একেবারে ছোটো থেকে দুজন একসঙ্গে লরেটোতে পড়ত। মৌসুমির বেস্ট ফ্রেন্ড।

পাকেচক্রে দুজনেই একই স্কুলে চাকরি পেয়েছে। নিধির জন্যেই মৌসুমির বাবা-মা মেয়েকে প্রথমবার এত দূরে আসতে দিয়েছেন। নিধিই আজকাল বাজারহাটে কথাবার্তা চালাচ্ছে।

মৌসুমীর বাবা আসবেন বলছিলেন। মৌসুমীই না করছিল। এখন দেখছে এলে বরং ভালো হত। এই পাহাড়ি মিশনারি স্কুলে হেডস্যার বড্ড কড়া। ভোর চারটেয় উঠে ঠিক ছটায় মর্নিং প্রেয়ারে উপস্থিত হতে হয়। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। তখন শরীর ক্লান্ত আর ওই অন্ধকারে বাড়ি খোঁজা প্রায় অসম্ভব। এদিকে সাতদিন হয়ে গেল। হোটেলে আর কাঁহাতক থাকা যায়! এদিকে স্কুলের চেনাজানা কেউ কোনও ভাড়াবাড়ির সন্ধানও দিতে পারছে না।

শেষে এক রবিবার স্কুলের দারোয়ান বন্ধন থাপাকে রাজি করিয়ে দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল বাড়ি খুঁজতে। তাতেও কি কম হ্যাপা! অনেকে দুজন মেয়েকে ভাড়া দিতে নারাজ, কোথাও ঘর পছন্দ হচ্ছে না, আবার ঘর পছন্দ হয় তো এত অতিরিক্ত বাড়িভাড়া যে তা সাধ্যের বাইরে। দুজনেই প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় বন্ধন বললে, "ম্যাডামজি, এওরা ঘর থিও। পাহারকো মাথি।" প্রথমে না বুঝলেও পরে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বন্ধন বোঝাল পাহাড়ের মাথায় একটা পুরোনো সাহেবি বাংলোবাড়ি আছে। সেই বাড়ির বুড়ি মালকিন তার গ্রাম সম্পর্কের মাসি। একটু যেতে হবে, কিন্তু বাড়িটা ভালো। অগত্যা! সরু পাহাড়ি পথ বেয়ে দুজন বন্ধনের পিছু নিল।

পাহাড়ি টিলার ওপরে ছোট্ট একটেরে বাড়ি। সাহেবি কেতায় বানানো। সবুজ চালের রং উঠে এখন কেমন একটা এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। লাল ইটের দেওয়াল ম্যাড়ম্যাড়ে। সামনে পোর্টিকোর পাশে জঙ্গলের মধ্যে ফুটে আছে কিছু হলিহক আর রডোডেনড্রন। এ বাড়ি পুরোনো হলেও নতুন মালিক তেমন যত্ন নিতে পারেন না, বোঝা যায়। কাঠের গেট সরিয়ে ওরা লনে ঢুকতেই কোথা থেকে ঘেউ ঘেউ করে দৌড়ে এল একটা ঝাঁকড়া লোম স্প্যানিয়েল আর তার পিছনে পিছনে "হাচি হাচি" করতে করতে এক নেপালি প্রৌঢ়া। বন্ধনকে দেখেই একগাল হেসে নেপালি ভাষায় কত কী বলে গেলেন তার বিন্দুবিসর্গও মৌসুমীরা বুঝল না। তবে মহিলা হিন্দিটা জানেন আর অল্প ইংরাজিও বলতে পারেন, তাই কথাবার্তায় অসুবিধা হল না। ওদের বসার ঘরে আদর করে বসিয়ে চিনামাটির ছোটো বাটিতে সোনালি চা আর ঘরে বানানো কুকি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন তিনি। চায়ের মৃদু গন্ধে ঘর ভরে গেল। কথায় কথায় জানালেন এই বাড়ি আগে এক সাহেবের বাংলো ছিল। ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেলেও সাহেব বহুদিন এই দেশে রয়ে গেছিলেন। তারপর এক রাতে সাহেবের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। মরার আগে এই বাড়ি তাঁর নেপালি খানসামাকে লিখে দিয়েছিলেন সাহেব। সেই থেকে তার পরিবারই এই বাড়ির একতলায় থাকে। দোতলায় কিছু ঘর আছে। সেগুলো বন্ধই থাকে। তার একটা ভাড়া দিতে পারেন তিনি। বাথরুম অ্যাটাচড।

ক্যাঁচক্যাঁচে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় পৌঁছাতেই মৌসুমীর মন ভালো হয়ে গেল। কাচের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘা শীতের যাই যাই রোদ্দুরে যেন সোনার বরন ধারণ করেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁদিকে ঘর। ঘর খুলতেই মন ভরে গেল দুজনের। পুরোনো শালকাঠের চেরা তক্তা দিয়ে তৈরি দেওয়াল। পায়ের কাছে কাচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূর দিগন্তে মিশে যাওয়া সবুজ পাহাড়, খাঁজে খাঁজে বয়ে চলা রঙ্গিত নদী। ঠিক ডানদিকেই উঁকি দিচ্ছে বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা। এমন ঘর কেউ ছাড়ে নাকি! নিধির

দিকে তাকিয়ে দেখল মৌসুমী। সেও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। এখন ভয় একটাই। ভাড়া।

মৌসুমীদের অবাক করে ভদ্রমহিলা বললেন মাসে দশ হাজার দিলেই চলবে। সঙ্গে সকালের ব্রেকফাস্ট ফ্রি। হাতে স্বর্গ পেল ওরা। পরদিনই হোটেলে চেক আউট করে নতুন ঘরে ঢুকে পড়ল দুজনে। আর এত কষ্টে ঘর পাবার আনন্দে পাশের লাগোয়া বন্ধ ঘরটাকে দুজনের কেউই খেয়ালও করল না।

৩

ঘর গোছগাছের জন্য হেডস্যারের কাছে দিন দু-একের ছুটি চেয়েছিল দুজনে। ভাগ্যি ভালো হেডস্যার মঞ্জুরও করেছেন। গুছিয়ে উঠতে প্রায় দেড় দিন লাগল। দ্বিতীয়দিন বিকেলে নিধিরই প্রথম চোখে পড়ল পাশের ঘরটা।

"হ্যাঁ রে মৌসুমী, এই ঘরটা দেখ! কী অদ্ভুত! বন্ধ!" বাংলাতেও বেশ সড়গড় নিধি।

"বন্ধ তাতে অদ্ভুতের কী হল? কাজে লাগে না তাই বন্ধ। আমাদের রুমটাও তো বন্ধই ছিল।"

"আরে ধুর! ভালো করে দেখ। ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ। বাইরের ছিটকিনি তো খোলাই আছে।"

"তাহলে অনেকদিন বন্ধ থেকে থেকে দরজা জ্যাম হয়ে গেছে। দাঁড়া ঠেলে দেখি।"

মৌসুমী বেশ কয়েকবার ঠেলা দিল। প্রথমে আস্তে। তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে। দরজা একচুল নড়ল না। আরও কয়েকবার ঠেলাঠেলি করে বিরক্ত মৌসুমী বলল, "বাদ দে। চল নিচে লনে ঘুরে আসি।"

লনে হাচি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মৌসুমী ওর সঙ্গে খেলায় মেতে গেল। নিধি একটু অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবছে। জিজ্ঞেস করতেই বলল, "এখান থেকে একবার দ্যাখ মৌসুমী। ওই যে উপরের পাশাপাশি দুটো ঘর। বাঁদিকেরটা আমাদের। দেওয়ালজোড়া কাচের জানলা। এদিকে ঠিক পাশের ঘরেই কোনও জানলা নেই। শুধু একেবারে উপরে একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি। এমন কেন?"

"তাহলে তো ঠিকই আছে। এটা ভাঁড়ার ঘর বা গুদাম টাইপের কিছু ছিল হয়তো। এখানে লোক থাকত না।"

"কিন্তু ভাঁড়ার ঘর তো নিচে..."

"সে তো এখন। সেই সাহেবের আমলে কী ছিল, তার ঠিক আছে?"

নিধি কোনওমতে মাথা নেড়ে "তাই হবে হয়তো" বলল বটে, কিন্তু মনের খচখচানিটা রয়ে গেল।

৪

শব্দটা প্রথম পেল নিধিই। ভোররাতের দিকে। চাপা কিন্তু স্পষ্ট। কোনও ধাতব বস্তুকে মাটিকে ঘষটানোর আওয়াজ। মাঝে মাঝে ধাতুর ঝনঝনানি। ঘুমের মধ্যে প্রথমে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। যখন পারল, তখন আওয়াজ আরও বেড়েছে। হাত বাড়িয়ে

নাইটল্যাম্পটা জ্বালিয়ে প্রায় ফিসফিস করে মৌসুমীকে ডাকল নিধি। ওর ঘুম অনেক বেশি গাঢ়। সহজে ভাঙতে চায় না। বেশ কয়েকবার ঠেলাঠেলির পর চোখ মেলল মৌসুমী। জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, "কী হল রে?"

"শোন, কীসের যেন একটা শব্দ।"

কান পেতে শুনল মৌসুমী। শব্দটা বাড়ছে।

"কোথা থেকে আসছে বল তো?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

মৌসুমী এবার খাটের ওপরে বসে পড়ল। চেষ্টা করল শব্দের উৎস খোঁজার। এদিকে সেই ধাতব শব্দ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আরও অদ্ভুত একটা শব্দ ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে গোটা ঘরে চারিয়ে যাচ্ছে। কেউ যেন পাশের ঘরের দেওয়ালে কিছু একটা ঘষে চলেছে। অবিরাম। অক্লান্তভাবে। একটা ঘ্যাসঘ্যাসে শব্দ আর ওয়ালপেপার ছেঁড়ার ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ। এবার সেই আওয়াজটা বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে তীব্র এক কিচকিচে অদ্ভুত ধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে। এবার আর কোনও সন্দেহ নেই। সব শব্দের উৎস ওই পাশের বন্ধ ঘর।

"মনে হয় ইঁদুর", বলেই তড়াক করে বিছানা থেকে নামল মৌসুমী। দরজা খুলেই পা বাড়াল পাশের ঘরের দিকে। একা এই সময় এই ঘরে থাকবে এত সাহসী মেয়ে নিধি না। সে-ও পিছু নিল। পাশের ঘরের ভারী দরজায় খানিক কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল মৌসুমী। আওয়াজ কমে আসছে। কিন্তু একটা চাপা গোঙানির শব্দ। একটা বাচ্চা মেয়ের গলা। তাহলে কি কাউকে এই ঘরে বন্দি করে রেখেছে এরা? সাহস করে চাবির গর্তে চোখ দিল মৌসুমী। আর দিয়েই চমকে উঠল। কিছু দেখতে পাবে আশা করেনি। কিন্তু দরজার ফুটো দিয়ে দেখল এক অদ্ভুত নীল আভা। স্বচ্ছ কেলাসের মতো। সেটা যেন জ্যান্ত। নড়ছে এদিক ওদিকে। সংবিৎ ফিরল নিধির ডাকে।

"কি রে? কিছু দেখতে পেলি?"

"নাহ", বলে উঠে গেল মৌসুমী।

সেদিন রাতে দুজনের কারও ঘুম এল না।

৫

দরজায় চোখ লাগিয়ে মৌসুমী যা দেখতে পেয়েছিল, সেটা নিধিকেও পরে বলল সে। নিধিও কিছু বুঝতে পারল না। শুধু বোঝা গেল ভয়ানক কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে এর পিছনে। বাড়ির মালকিন ইয়াংজিকে জিজ্ঞেস করে খুব বেশি লাভ হল না। একে তো তিনি বাড়ির বউ, বাড়ির ইতিহাস নিয়ে খুব বেশি আগ্রহ তাঁর নেই। বাড়ির দোতলায় তিনি কদাচিৎ যান। তিনি পরিষ্কার জানালেন আজ অবধি এই বাড়িতে তিনি কোনও আওয়াজ শোনেননি, বা ওই ঘর বন্ধ কেন তা জানার বদ খেয়ালও কোনও দিন তাঁর হয়নি। মৌসুমীদেরই বা এমন খেয়াল কেন হল তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

মৌসুমী বুঝল এঁকে জিজ্ঞেস করা বৃথা। এদিকে পাশের ঘরের শব্দ বন্ধ হচ্ছে না। এটা কোনও প্যাটার্ন মেনে চলে না। কোনও রাতে হয়, কোনও রাতে হয় না। এমনকি বেশ কবার সন্ধ্যা আর দুপুরেও এই আওয়াজ শুনেছে ওরা। আওয়াজ শুনলেই দরজার

পিপহোলে চোখ লাগায় ওরা। আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। আর সেই স্বচ্ছ নীলাভ আভা। ঘরের ভিতরের কিচ্ছুটি দেখা যায় না।

দিন সাতেক বাদে, সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ব্রেকফাস্ট করতে গেছিল মৌসুমী। খাবারের টেবিলে এক অতিবৃদ্ধ গোর্খাকে দেখে চমকে গেল। আগে তো কোনও দিন এঁকে দেখেনি সে! চুল ধবধবে সাদা। চামড়া ঝুলে গিয়ে চোখের উপরে এসে চোখ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। খাবার টেবিলে মৌসুমীকে দেখেই চোস্ত ব্রিটিশ উচ্চারণে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "ভেরি গুড মর্নিং ইয়াং লেডি। হোপ এভরিথিং ইজ ফাইন।" গোর্খাদের মধ্যে এইরকম উচ্চারণ আগে শোনেনি মৌসুমী। আলাপ করে জানতে পারল ইনি পেম্বা তামাং। বাড়ির আদত মালিক। এঁকেই বাড়ি দান করে মারা গেছিলেন সাহেব। তাহলে তো এই বাড়ির সব ইতিহাস ইনিই জানবেন! গল্প জুড়ল মৌসুমী।

জানতে পারল এই ধরনের পাশকপালি "কুইন অ্যান" বাড়ি খুব বেশি নেই কালিম্পং-এ। অনেকদিন আগে এক নীলকর সাহেব ছিল। নাম টমাস ম্যাকগ্রেগর। প্রচণ্ড অত্যাচারী। রায়তরা তাঁকে ডাকত ম্যাকগরগর সাহেব বলে। নীলবিদ্রোহ শুরু হলে রায়তরা তাঁকে পিটিয়ে মারে। তাঁর বউ ছেলে কোনওমতে পালিয়ে বাঁচে। তাঁর এক বন্ধু ছিলেন ড্যানিয়েল সাহেব। ভালো মানুষ। দার্জিলিং-এর চা বাগানের মালিক। তাঁর কাছেই মানুষ হয় টমাসের ছেলে ডেভিড। ডেভিড বড়ো হলে তাঁকেও চায়ের ব্যবসার অংশীদার করার প্রস্তাব দেন ড্যানিয়েল। শর্ত একটাই। বিয়ে করতে হবে তাঁর মেয়ে এলিজাকে। এলিজা ছিল পাগল। লোভে পড়ে বিয়ে সেরেই ফেলেন ডেভিড। ব্যবসায় লক্ষপতি হলেও সংসারে সুখ ছিল না। দার্জিলিং থাকাকালীনই তাঁদের এক মেয়ে হয়। মারিয়া। মারিয়ার জন্মের পরেই তার মায়ের পাগলামো বাড়তে থাকে। অকারণে ছুরি দিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইতেন তিনি। একদিন হাত পা বেঁধে ভাঙা কাচের টুকরো দিয়ে চিরে দিতে থাকেন মারিয়ার শরীর। মারিয়া তখন বড়োজোর দশ বছরের হবে। খানসামা পেম্বা না থাকলে হয়তো মারাই যেত বেচারি। ঠিক দুই দিন পরে এলিজার দেহ সিলিং থেকে লটকানো দেখতে পান পেম্বা-ই। স্ত্রী পাগল হলেও তাঁকে ভালোবাসতেন ডেভিড। একেবারে ভেঙে পড়েন এই ঘটনায়। সব ব্যবসাপাতি গুটিয়ে কালিম্পং চলে এলেন। তৈরি করলেন এই বাড়ি।

"তারপর?" চমকে উঠে মৌসুমী দেখল কোন ফাঁকে নিধি এসে তার পাশে বসে গল্প শুনছে।

"কিন্তু মারিয়ার রক্তে পাগলামো ছিল", আবার বলতে শুরু করলেন পেম্বা। "মায়ের গুণ পেতে লাগল ধীরে ধীরে। তার মধ্যেও ধীরে ধীরে নিজেকে শেষ করার এক উদগ্র বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। ব্লেড, ছুরি, যা হাতের কাছে পেত হাত পা কাটত।"

"ডাক্তার দেখাননি মারিয়াকে?" এবার মৌসুমীর প্রশ্ন।

পাশাপাশি মাথা নাড়লেন পেম্বা। "নাহ। কাউকে না। ওকেও না, ওর মাকেও না। সাহেবের এই এক অদ্ভুত বাই ছিল। ভাবতেন ডাক্তার দেখালে তাঁর বদনাম হবে। তাই লোকের কাছে বলতেন স্ত্রী অসুস্থ। আর মারিয়ার বেলা যেটা করলেন সেটা আরও পাশবিক।"

"কী?"

"কালিম্পং-এ আসার পর থেকেই মারিয়াকে ওপরের ঘরে বন্দি করে রাখা হত। ওকে কেউ দেখতে পেত না। ওর কথা কেউ জানতও না। আমি আর সাহেব ছাড়া। কেউ

জিজ্ঞেস করলে সাহেব বলতেন তাঁর মেয়ে বউ দার্জিলিং-এ থাকতেই মারা গেছে। জলজ্যান্ত একটা মেয়েকে মেরে ফেলে দিলেন সাহেব। এদিকে বেচারা মেয়েটা সারাদিন ঘরে বসে বসে কাঁদত। একটিবার বাইরে যেতে চাইত। দিনরাত দেওয়ালের গায়ে নখ দিয়ে আঁচড় কেটে কী লিখত কে জানে! আমিই ওকে ঘরে খাবার পৌঁছে দিতাম দুবেলা। তারপরে একদিন সাহেব খুন হলেন।"

"খুন হলেন মানে?"

"সে আর-এক রহস্য। তখন দেশ সবে স্বাধীন হয়ছে। সাহেব ঠিক করলেন মেয়েকে নিয়ে লন্ডন চলে যাবেন। বাড়ি লিখে দিলেন আমার নামে। একদিন মারিয়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বলছিলেন লন্ডন যাবার ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গেছে। এক মাসের মধ্যেই তিনি চলে যাবেন। আমার এখনও মনে আছে। সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি। আমরা দুজন উপরে মারিয়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, এমন সময় খিল লাগানোর শব্দ। আমি, সাহেব বারবার দরজা ধাক্কালাম। চিৎকার করলাম। মারিয়া কিছুতেই দরজা খুলল না। এদিকে সাহেব বেশি লোক জানাজানি হোক চান না। আমি বললাম কার্শিয়াং-এ আমার ভাইয়ের বাড়ি। সে এসব দরজা নিমেষে খুলতে পারে। সাহেব রাজি হলেন। সেই রাতে বৃষ্টির মধ্যেই আমি কার্শিয়াং রওনা হলাম। পরদিন ফিরেই দেখি বাড়ির সামনে পুলিশ। আমি ঢুকতেই আমায় গ্রেপ্তার করল। আগের দিন রাতে সাহেব খুন হয়েছেন। খুব ধারালো কিছু দিয়ে তাঁর সারা শরীর কেউ চিরে দিয়েছে। পুলিশের সন্দেহ আমিই খুন করেছি। মামলা চলল। প্রমাণ হল আমি সেদিন রাতে ছিলামই না। ছাড়া পেয়ে এই বাড়িতেই এলাম।"

নিধি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আর মারিয়া? ওর কী হল?"

"সেটা কেউ জানে না। আমি পুলিশকে মারিয়ার কথা বলেছিলাম। পুলিশ বিশ্বাস করেনি। উপরের এই ঘরের দরজা হাট করে খোলা ছিল। ভিতরটা ফাঁকা। ফাঁকা আর পরিষ্কার। একটা ধুলোর কণাও ছিল না গোটা ঘরে। যেন কেউ ঘরের সব কিছু শুষে নিয়ে গেছে। পুলিশের সামনেই দরজাটা আচমকা বন্ধ হয়ে যায়। আর কোনও দিন অনেক চেষ্টা করেও কেউ খুলতে পারেনি। আমি এই বাড়িতে আসার পরেও বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। সেই রাতে ঠিক কী হয়েছিল তা আজও আমার অজানা।"

৬

ঘর থমথমে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। প্রথম কথা বলল নিধি।

"আঙ্কেল, আপনার কাছে মারিয়ার কোনও ছবি আছে?"

"আছে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।" বলে অল্প লেংচে লেংচে পাশের ঘরে চলে গেলেন ভদ্রলোক। ফিরে এলেন একটা মোটা কার্ডবোর্ড বাঁধানো ছবি নিয়ে। হাতে আঁকা না। ফটোগ্রাফ। সাদাকালো ছবিতে রং বুলিয়ে কালার করা। এই ধরনের ছবি এককালে বেশ জনপ্রিয় ছিল ভারতে।

"আমার কী মনে হয় জানো?" নিধির হাতে ছবিটা ধরিয়ে দিয়ে আপনমনে বলতে থাকেন পেম্বা, "আমার ধারণা মারিয়া আজও ওই ঘরেই আছে। জানি তোমরা আমায় পাগল বলবে। ইয়াংজিও বলে। কিন্তু আমি ওর চলার আওয়াজ পাই। কাঠে নখ ঘষার

আওয়াজ পাই। শিকলের ঝনঝন শব্দ শুনতে পাই। যেমন আগে পেতাম। বয়স প্রায় একশো হল। সবাই বলে মনের ভুল...”

মৌসুমী তখন মারিয়াকে দেখছিল। এ ছবি দার্জিলিং-এ তোলা। দাস স্টুডিওতে। ছোট্ট মারিয়া। মাথাভরা চুল। মুখটা কেমন বিষণ্ণ। মায়াভরা। মৌসুমীর খারাপই লাগছিল মেয়েটার জন্য।

হঠাৎ নিধিকে দেখে চমকে উঠল সে। নিধির চোখ বড়ো হয়ে গেছে। মুখ হাঁ করে খলা। গোটা দেহ শক্ত। যেন চরম কোনও আতঙ্ক তাকে এক মুহূর্তে স্ট্যাচু বানিয়ে দিয়েছে।

“অ্যাই নিধি? কী হল? এরকম করছিস কেন?”

ফিসফিস করে নিধি শুধু বলতে পারল, “মারিয়ার চোখ... নীল রঙের... মানে... আমরা যখন পিপহোল দিয়ে মারিয়াকে দেখি, মারিয়াও আমাদের দ্যাখে!”

লেখকের জবানি : এই কাহিনি আমার নিজের কানে শোনা। আমার এক দূর সম্পর্কের বোন মৌসুমী পুনেতে ঘর খুঁজতে গিয়ে শুনেছিল এক সাহেবের বাংলোবাড়িতে নাকি কেউ ঘর নেয় না। কারণ তাতে ভূত আছে। একটা বাচ্চা মেয়ে মারা গেছিল সেই ঘরে। আমি পুনে যাইনি। কিন্তু কালিম্পং-এ কর্মসূত্রে প্রায় দশ বছর ছিলাম। এখানে যে বাড়িটার কথা বলা হয়েছে, ওটা আদতে সেই বাড়ি যেখানে আমি নিজে দশ বছর থেকেছি।

শল্লের নাভি

এই গল্প আমার না। সত্যি বলতে কী, এটা গল্প, নাকি সত্যি ঘটনা, সেটাও ঠিক জানা নেই। বাড়ির একটা ড্রয়ারের চাবি বহুদিন পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রতিবারই পাওয়া যাবে ভেবে কেউ আর ড্রয়ারটা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। অবশেষে বছর দু-এক আগে চাবিওয়ালা ডেকে ড্রয়ারটা খোলা হয়। ভিতরে জরুরি কিছু নেই। শুধু একটা আতশকাচ, কিছু শুকনো ফুল আর একটা টিনের বাক্সের মধ্যে একটা বাঁধানো খাতা ছিল। চামড়ায় বাঁধানো। রয়্যাল সাইজ। আমার পিতামহ স্বর্গীয় বলহরি মজুমদারের খাতা। তাঁর এমন অদ্ভুত নামের কারণ আমি ছোটোবেলায় বহুবার জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি এড়িয়ে যেতেন। বাবা, জেঠু বা পিসিদের জিজ্ঞাসা করেও কোনও উত্তর পাইনি। তাঁরাও নাকি জানতেন না। খাতার মধ্যে ছোটো ছোটো হিসেবপত্র, রামঠাকুরের বাণী ইত্যাদির পর কয়েক পাতা উনি নিজেকে নিয়ে লেখার চেষ্টা করেছিলেন। অনেকটা আত্মজীবনীর মতো। সেই সামান্য কটি পাতাতেই তাঁর নামের কারণ হিসেবে এই গল্প রয়েছে। যে কাহিনি এতকাল সযত্নে সবার থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি, সেটাই আপনাদের বলব। তাঁর ভাষা ও বানানে সামান্য কিছু পরিবর্তন করলাম।

"আমার পিতৃদত্ত নাম প্রফুল্লকুমার মজুমদার। আদি বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকা বিক্রমপুরের টঙ্গি। বাংলাদেশে থাকাকালীন ওখানেই পোস্টাল অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টে করণিকের চাকরি পাই। আমার বিবাহ আর প্রথম দুই সন্তানের জন্ম ওই দেশেই। দেশভাগের আগে ১৯৪৩ সালে আমি কলকাতায় বদলি হই ও সেই থেকে আজ অবধি ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েই বসবাস করছি। এখন এই দেশকেই আমি আমার দেশ মেনে নিয়েছি।

ডায়রিতে মিথ্যা লিখতে নেই। এক ভয়ংকর ঘটনায় আমার নাম প্রফুল্ল থেকে পরিবর্তন করে বলহরি রাখা হয়। আমি নিজেও অনেক পরে তা জেনেছি। সে ঘটনা আমার স্মৃতিতে নেই ঠিকই, কিন্তু তার প্রমাণ আমি আজও বহন করে চলেছি। এ কথা আমি কাউকে কোনও দিন বলিনি, বা বলব না। কারণ একটাই। আমি নিজেই ঘটনাটা পুরো বিশ্বাস করতে পারি না।

বিক্রমপুরে আমাদের দেশের বাড়ির ঠিক পাশেই এক শ্মশান ছিল। খুব বড়ো শ্মশান না, আশেপাশের কয়েক ঘর লোকজনের কেউ মারা গেলে ওখানেই পোড়ানো হত। শ্মশানের একপাশ দিয়ে ছোটো একটা সোঁতা ছিল। আমি বড়ো হবার আগেই তা শুকিয়ে যায়। সেই শ্মশানের ডোম ছিল হরিয়া। হরিয়ার পুরো নাম কেউ জানত না। সারাদিন মদ খেয়ে দুই চোখ লাল। টলতে টলতে চলে, কিন্তু মড়া এলেই একেবারে সিধা। তখন তার গায়ে হাতির বল। নিজেই কাঠ কেটে চিতা সাজিয়ে মড়া পোড়াত। যতক্ষণ মড়া পুড়ছে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত মড়ার দিকে, যেন কোনও নাটক বা সিনেমা দেখছে।

আমার ছোটোকাকা পরেশচন্দ্র একটু বাউন্ডুলে স্বভাবের ছিলেন। পড়াশুনো মাথায় ঢুকত না। ঠাকুর্দা বহুবার বলেও তাঁকে ইন্টার দেওয়াতে পারেননি। সেই ছোটোকাকা হরিয়ার চ্যালা হয়ে গেলেন। দিনরাত শ্মশানে পড়ে থাকতেন। হরিয়ার ফাইফরমাশ খাটতেন। তার নেশার জিনিস নিয়ে আসতেন। ঠাকুর্দারা কেউই ব্যাপারটা ভালো চোখে

দেখেননি। কাকাকে ঘরমুখী করার জন্য মাত্র ষোলো বছর বয়সেই কাকার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। কাকিমা ছিলেন ঢাকারই মেয়ে। আমাদের পালটি ঘর। একেবারে শান্ত, চুপচাপ। কাকার পুরো বিপরীত। বিয়ে দেবার পরও কাকার কোনও বদল হল না। বরং শ্মশানে যাওয়া বেড়ে গেল। ঠাকুর্দা হাল ছেড়ে ভাঙা মনে মারাই গেলেন।

ঠাকুর্দা মারা যাবার এক মাসের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। এক রাতে তুমুল ঝড়বৃষ্টি আর সেরকমই বাজ। পরের দিন ভোরে কাকা হরিয়ার কুঁড়েঘরে গিয়ে চমকে গেলেন। বাজ পড়ে কুঁড়েঘরের একটা অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আর তার ভিতরে আধপোড়া হয়ে মরে পড়ে আছে হরিয়া। মদের নেশায় উঠে পালাতে অবধি পারেনি। এই ঘটনা নিয়ে আমাদের বাড়ির আশেপাশে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। হরিয়া সবার মড়া পোড়াত। এবার তার মড়ার সৎকার করবে কে? শোনা গেল পাশের গ্রামে নাকি আর-এক চণ্ডাল আছে। কিন্তু দুর্যোগের দিনে তাকে কে ডাকতে যাবে ইত্যাদি নিয়ে প্রায় সারাদিন গেল। সন্ধেবেলা যখন সে এল, তখন প্রায় সারাদিন হরিয়ার আধপোড়া দেহ ওই কুঁড়েতেই অরক্ষিত অবস্থায় আছে। শুনেছি কাকা খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। বাবা একটু খুশি হয়েই বলেছিলেন, "হরিয়া আমাগো পোলাডার মাথা খাইসিল। অ্যাহন যদি ঈশ্বর অরে সুমতি দ্যান..।" মড়া পোড়ানোর সময় আর-এক কাণ্ড। পোড়ানো তখন প্রায় শেষ, আবার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে ভয়ানক বাজ। সেই ডোম উপায় না দেখে আমাদেরই এক পড়শি হারাধন কাকার বাড়িতে আশ্রয় নিল। মাঝরাত নাগাদ বৃষ্টি কমলে মশাল জ্বালিয়ে তিন-চারজন গেল দেখতে। মড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল প্রায়। কিন্তু সেই ডোম কী যেন দেখে চমকে উঠল। বারবার করে খুঁজতে লাগল। প্রায় আধঘণ্টা খুঁজেও যখন পেল না, তখন তার চোখেমুখে স্পষ্টই ভয়ের ছাপ।

— বাবু, আফনেরা এট্টু সাবধানে থাইক্যেন।

— ক্যান? কী হইল আবার?

— বাবু, হরিয়ার খুলি আর নাইখান কে য্যান লইয়া গ্যাসে। আমার ভাল্লাগতাসে না বাবু....

— ক্যান নিব? ঠিক কইর্যা দ্যাখ। আসে এদিক ওদিক..

— আমি দেখসি বাবু। কোথাও নাই। কেউ লইয়া গেসে।

সেই ডোম হাউমাউ করে এরপর যা বলল তার মানে শনিবার অমাবস্যা তিথিতে হরিয়া অপঘাতে মরেছে। তার দেহ উপযুক্তভাবে দাহ হয়নি। এদিকে তার খুলি আর নাভি পাওয়া যাচ্ছে না। এ এক ভয়ানক অমঙ্গল। চণ্ডাল অপঘাতে মরলে চণ্ডু হয়। আর তার নাভি থেকে হয় শল্ল। একবার চণ্ডু হলে গয়ায় পিণ্ডি দিয়েও নাকি উদ্ধার নেই। যেদিন বজ্রপাতে মারা গেছে সেইদিন থেকে ২০০০ চান্দ্রমাস তাকে চণ্ডু হয়ে থাকতে হবে। গোলামি করতে হবে সেই মানুষটির, যার কাছে তার খুলি আছে। শল্ল আরও খারাপ। কেউ এই শল্ল জোগাড় করে কারও ভিটাতে পুঁতে দিলে এক বছরের মধ্যে তার ভিটামাটি উচ্ছন্নে যাবে। তারা নির্বংশ হবে। তবে... বলে সেই ডোম চুপ করে গেল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে দিয়ে কেউ আর একটা কথাও বলাতে পারেনি। পরের দিন সকালের আলো ফুটতে না ফুটতে ডোম তার গ্রামে ফিরে গেল। তাকে দস্তুরি দিতে চাইলেও সে এক পয়সা নেয়নি। শুধু বারবার বলেছিল, 'আপনারা সাবধানে থাকুন বাবু... খুব খারাপ কিছু হতে চলেছে।'

আমি তখন মায়ের পেটে। বাবার কাছে শুনে মা খুব স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেলেন। কেউ তাঁকে পরামর্শ দিলেন ওঝা ডেকে বাড়ি বন্ধন করার। ওঝা এসেওছিল। কিন্তু বাড়ি বন্ধন করা যায়নি। যতবার বাড়ির চারদিকে মন্ত্রপড়া জলের ঘট রাখা হচ্ছিল, ততবার সেটা নাকি উলটে যাচ্ছিল, যেন কেউ ইচ্ছে করে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। ওঝা যাবার আগে বলে গেল, 'মা ঠাইরান, গতিক ঠিক নাই। সাবধানে থাইক্কেন।'

হরিয়া মারা যাবার পর কাকার বাইরে বেরোনোর নেশা কমে গেল অনেকটাই। ছোটোকাকা বাড়ির বাইরে উঠানে একটা ছোটো কুঁড়েঘর মতো বানিয়ে নিলেন। ওখানেই নাকি সাধন ভজন করবেন। ঘরেই থাকতেন। কী সব যেন করতেন। আর কাগজে হিজিবিজি লিখতেন। বাবা আপত্তি করলেও যখন ভাবলেন বেশি মানা করলে হয়তো বাড়ি ছেড়ে আবার শ্মশানে শ্মশানে ঘুরবে, তখন নিমরাজি হলেন। কাকিমা অনেক কেঁদেও সুরাহা করতে পারলেন না। কাকা রাতের পর রাত ওই ঘরেই কাটাতে লাগলেন। স্বপাক রান্না করতেন। সারাদিনে তাঁর মুখ প্রায় দেখা যেত না বললেই চলে। প্রথম ঘটনাটা ঘটল হরিয়া মারা যাবার ঠিক এক মাস পরে। আবার এক অমাবস্যার রাতে। আমাদের পাড়ায় যতীন বাঁড়ুজ্যেরা বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিলেন। তিন ছেলে, দুই ছেলের বউ। পাকা বাড়ি, জমিজমা নিয়ে এলাহি কারবার। অনেক আগে একবার ওঁদের খাতাপত্রের হিসেব রাখার জন্য ঠাকুর্দা ছোটোকাকার হয়ে তদবির করেছিলেন। যতীনবাবু কাকার সামনেই ঠাকুর্দাকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দেন। সেই যতীনবাবুকেই তাঁর ঘরে মরা অবস্থায় পাওয়া গেল। জিভ বের করা, গলায় লাল দাগ, চোখ ঠিকরে বেরোচ্ছে। অপঘাতে মৃত্যু বলে তিনদিনে শ্রাদ্ধ হল। সেদিনও ঝামেলা। আত্মা নাকি কিছুতেই পিণ্ড গ্রহণ করছে না। পিণ্ড মাখতে গেলেই তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। মনোহর আচার্যি ছিলেন অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। সেই পিণ্ড খেতে গিয়ে গলায় আটকে তাঁর প্রাণ যায় যায় দশা। পাড়ার সবাই বুঝল, কিন্তু কেউ মুখে উচ্চারণ করল না। শল্ল তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। ঠিক একমাস পর থেকে।

এর মধ্যে আমার মা একদিন ভয় পেলেন। পোয়াতি মহিলা, রাতে ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম ভাঙল অদ্ভুত অস্বস্তিতে। জেগে জানালা দিয়ে দেখেন বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কাকার ঘরের দিকে তাকিয়ে ভয়ে তাঁর গলা শুকিয়ে এল। বিরাট কালো শকুনের মতো একটা পাখি কাকার ঘরের চালে বসে আছে। কিন্তু এ কেমন শকুন, যার মুখটা অবিকল মানুষের মতো! কাকার ঘরের দরজা খুলে গেল। কাকা বেরিয়ে এলেন। কাকার দুই হাতে ছটফট করছে দুটো মুরগি। কাকা সে দুটো উঠোনে রাখলেন। পাশে রাখলেন ধামাভরা মুড়ি। মা এত অবাক হয়ে গেছিলেন তাঁর গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। পাখিটা অদ্ভুত সরসর করে নেমে এল। কাকা হাত দিয়ে মুরগির মাথা দুটো ছিঁড়ে পাখির সামনে রাখলেন। পাখিটা চোখ তুলে সোজা তাকাল মায়ের দিকে।

যখন মায়ের মুখে এই গল্প শুনেছি, তখন আমি বছর দশেক হবে। তখনও দেখেছি মা এই জায়গাটা বলতে গিয়ে শিউরে ওঠেন। তাঁর গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। মা স্পষ্ট দেখলেন পাখিটার মুখ শুধু মানুষের মতো না। চেনা একজন মানুষের মতো। হরিয়া...

সেই রাতেই মায়ের প্রচণ্ড রক্তপাত শুরু হয়। বাবা ভোর হতেই দাই মাকে ডেকে আনেন। সব দেখেশুনে তিনি নাকি মাকে বলেছিলেন এই বাড়িতে অপদেবতার ভর আছে। বলেছিলেন সন্ধ্যার পর চুল খোলা না রাখতে, রাতে জানলা বন্ধ রাখতে, বাইরে না বেরোতে। একটা তাগাও যেন বেঁধে দিয়েছিলেন মায়ের হাতে। বলেছিলেন আমার যখন পাঁচ বছর হবে, তার আগে যেন মা ওটা না খোলেন। কিছুটা সেরে উঠে মা শুনতে পান যতীন বাঁড়ুজ্যের বড়ো ছেলে আগের রাতে বাইরে বেরিয়েছিল বাহ্যি করতে। কে

যেন তার টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। মা পরে কাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঠাকুরপো, কাইল ভোররাত্তিরে ঘরের বাইরে তুমি কী করত্যাসিলা?" কাকা নাকি অম্লানবদনে বলেন যে তিনি সারারাত নিজের ঘরেই ঘুমিয়েছেন। মা যা দেখেছেন সব ভুল।

বছর ঘুরল না, যতীনবাবুর বাড়ির সবাই একে একে মারা গেলেন। সব অপঘাতে। অত বড়ো বাড়ি খাঁ খাঁ করত। এবারে সবাই নিশ্চিত হল কেউ না কেউ তাঁর বাড়ি শল্লের নাভি ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এখানেই কি শেষ? নাকি শল্লের খিদে এখনও মেটেনি? আমাদের পাড়ায় সর্বদা একটা থমথমে পরিবেশ। এদিকে আমি ততদিনে জন্মে গেছি। আমার ছয় মাস বয়স। অন্নপ্রাশন, নামকরণ সব হয়ে গেছে। কাকাও কুটির ছেড়ে আমাদের মূল বাড়িতে এসে থাকেন। কুঁড়েঘর তিনি নিজের হাতে ভেঙে দেন। শুধু স্মৃতি হিসেবে একটা ছোট্ট ঢিপি আর তাতে একটা বেলগাছ লাগানো ছিল সেই জায়গায়। মায়ের মনে অনেকদিন একটা সন্দেহ দানা বাঁধছিল, বাবাকে বলেওছিলেন, কিন্তু বাবা আমল দেননি। 'কী যে কও' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমার কাকিমা মাখনলতার কোনও সন্তানাদি ছিল না। লোকে আড়ালে তাঁকে বাঁজা বলত। তাঁর সব স্নেহ তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন আমার জন্য। দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি আমাকে নিয়েই কাটাতেন। সাজাতেন নিজের মতো করে, গান শোনাতেন, ঘুম পাড়াতেন। সবই মায়ের কাছে শোনা। আমার কোনও স্মৃতি নেই।

এখন যেদিনের ঘটনা লিখব, সেদিন নীলপুজো। পুজোর সরঞ্জাম গোছাতে গিয়ে মা খেয়াল করলেন বেলপাতা কম পড়ে গেছে। হালদার বাড়ির বড়ো বেলগাছ ছিল বটে, কিন্তু সে বেশ দূরে আর ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মা পুজোয় বসে গেছেন। জল ঢালা হয়েছে। এখন ওঠাও মুশকিল। মা কাকিমাকে বললেন, 'ছোড, ঠাকুরপোর অই বেলগাছ থিক্যা কটা বেলপাতা পাইড়্যা আনবি?' কাকিমা পাতা আনতে গেলেন। মা অপেক্ষা করছেন। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেলেও যখন কাকিমা এলেন না, মা বাধ্য হয়ে পুজো ছেড়ে উঠলেন। বাবা আর কাকা কোনও কাজে ঢাকা টাউনে গেছিলেন। ফিরতে রাত হবে। বেরিয়ে যা দেখলেন তাতে মায়ের চক্ষুস্থির। দেখেন সেই বেলগাছের ঢিপির পাশে অদ্ভুত ভাবে বসে আছেন কাকিমা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাঁর সব অঙ্গ অসাড়। মাকে দেখে ফ্যাসফ্যাসে গলায় কাকিমা শুধু বললেন, 'উঠতে পারত্যাসি না দিদি, উঠতে পারত্যাসি না।' মা দৌড়ে এসে কাকিমাকে ওঠানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাকিমার ওজন যেন এক নিমেষে হাজারগুণ বেড়ে গেছে। মা সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও কাকিমাকে একচুল নাড়াতে পারলেন না।

মায়ের চিৎকারে আশেপাশের বাড়ির লোক ছুটে এল। প্রথমে মহিলারা, তারপর পুরুষরাও হাত লাগাল। কাকিমাকে একচুল নড়ানো গেল না। ততক্ষণে কাকিমা অজ্ঞান হয়ে এলিয়ে পড়েছেন। তবুও তাঁকে নড়ানো যাচ্ছে না দেখে এবার সবাই ভয় পেলেন। ঠিক হল ওঝা ডাকতে হবে। ওঝা পাশের গ্রামে। রাত হয়েছে। বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই। কে যাবে এই নিয়ে বাকবিতণ্ডা করতে করতে রাত প্রায় আটটা বাজল। শেষে পাশের বাড়ির গজানন রায় আর তাঁর দাদা লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে চললেন ওঝা আনতে। তাঁরা যাবার খানিক বাদে বাবা আর কাকা ঢুকলেন। কাকাকে ঢুকতে দেখেই কাকিমা নাকি শোয়া অবস্থা থেকে একেবারে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর অদ্ভুত পুরুষালি গলায় কাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ছোটোবাবু, এতক্ষণে আইলেন?' কাকিমাকে ওই ঢিবির কাছে দেখে কাকার চোখ কপালে উঠল। চিৎকার করে বললেন, 'তুমি ওহানে ক্যান গেস ছোড বউ? কে তোমারে যাইতে কইসে?' কাকিমা উত্তর দিলেন না। তাঁর মুখ হাসি হাসি।

সারা শরীর হাসির দমকে দুলছে। কিন্তু মুখ দিয়ে যে আওয়াজ বেরোচ্ছে তা হাসির নয়। যেন কোনও পিশাচ কারও গলা টিপে ধরেছে, এমন পৈশাচিক গোঁ গোঁ শব্দ। মা কাকাকে জানলেন ঠিক কী হয়েছিল। 'ও নিশ্চয় ঢিপিতে পাড়া দিসিলো' বলে কাকিমাকে টেনে সরাতে চাইলেন কাকা। কিন্তু কাকিমার দেহে মত্ত হাতির জোর। তবে হাসি থেমেছে। মুখ থেকে গ্যাঁজা উঠছে।

ওঝা এসে প্রথমেই কাকাকে জিজ্ঞেস করলেন ঢিবিতে কী পোঁতা আছে। এদিকে আমি ঘরের ভিতরে কাঁদছিলাম বলে মা আমাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। মা প্রথমে কিছু শুনতে পেলেন না। পরে ওঝা রীতিমতো ধমক দেওয়ায় কাকা প্রায় ফিসফিসে স্বরে বললেন, 'চণ্ডুর হাড়।' ওঝাও অবাক।

— এ হাড় আফনে পাইলেন ক্যামনে?

— হরিয়ার হাড়। ও অমাবস্যায় মরসিলো। আমি চিতা থিক্যা উঠাইসিলাম।

— আর কী উঠাইসিলেন?

কাকা জবাব দেন না। ওঝা আবার ধমকে ওঠেন।

— সত্যি কইর‍্যা কন। আর কী উঠাইসিলেন?

— শল্লর নাভি।

— সে নাভি কোথায় পুঁতসিলেন?

— যতীন বাঁড়ুজ্যেগো বাড়ি।

— ক্যান?

— বাপেরে আকথা কুকথা কইসিল, তাই।

— চণ্ডুর হাড় বশ করা আফনেরে কে শিখাইল?

— হরিয়াই কইসিল আমারে।

— বাঁড়ুজ্যেগো সকলে মরণের পর আফনে শল্লডার সৎকার করসেন?

কাকা পাশাপাশি মাথা নাড়লেন। করেননি। শল্লর নাভি ওই বাড়িতেই পোঁতা আছে। ওঝা বারবার কপালে করাঘাত করলেন। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী। চণ্ডুর হাড় আর শল্লের নাভি একে অপরের পরিপূরক। চণ্ডুর করোটিকে বশ করে শল্লকে দিয়ে কাউকে ধ্বংস করে ফেলা যায়। কিন্তু কাজ শেষের পর সঙ্গে সঙ্গে সেই শল্লের নাভিকে যথাবিহিত সৎকার করতে হবে। চণ্ডুর হাড় কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। শল্লকে ধবংস না করলে সেই করোটির হাড় নিজেই শল্লকে নির্দেশ দিয়ে কাজ করায়। আর সে কাজ বড়ো ভয়ানক। প্রথমেই সে আক্রমণ করে তাকে যে বশ করেছিল তার কোনও প্রিয়জনকে। সেদিন ঢিবিতে কাকিমার পা পড়াতে চণ্ডুর করোটি জাগ্রত হয়েছে। সে-ই শল্লকে দিয়ে এসব করাচ্ছে।

কাকা মাথা নিচু করে বসে আছেন। ঘরভরা লোকের সামনে তাঁর কীর্তি ফাঁস হয়ে গেছে। বাবাই প্রথম কথা বললেন, 'এহন উপায়?'

ওঝা জানালেন শল্লকে মাটি থেকে উঠিয়ে এনে যজ্ঞের আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু তার আগে কাকাকে এই জায়গা থেকে সরাতে হবে। কারণ শল্লকে ধ্বংস হতে দেখলে চণ্ডু নাকি যাকে ভর করে তার প্রিয়তম মানুষকে শেষ করে তারপর নিজে

শেষ হয়। কাকা গিয়ে দেখিয়ে দিলেন কোথায় শল্লের নাভি পুঁতেছেন। ওঝা নিজে সেখান থেকে নিয়ে এলেন। কাকা এলেন না। রয়ে গেলেন পাশের বাড়িতে। কাকিমা তখনও সেই ঢিবির পাশে বসে। যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হল। ওঝা তাঁর গেরুয়া রঙের থলির ভিতর থেকে কাপড়ে মোড়া মাথার খুলি বার করলেন। তাতে ঢাললেন কড়া মদ। মদের ওপরে সিদ্ধি পাতা আর মুড়ি ছড়িয়ে দিলেন। তারপর শুরু হল মন্ত্র। কাকিমার চোখ লাল। বনবন করে ঘুরছে। মুখ থেকে এমন অপার্থিব সব শব্দ বেরোচ্ছে যা পৃথিবীর কোনও মরমানুষের পক্ষে করা সম্ভব না। ওঝা মন্ত্র পড়ছেন, কাকিমার গোঙানি বাড়ছে। ঠিক যেই মুহূর্তে ওঝা শল্লর নাভিকে আগুনে ফেলতে যাবেন, জ্যা-মুক্ত তিরের মত কাকিমা ছুটে চলে এলেন মায়ের কাছে। তারপর সোজা কামড় বসিয়ে দিলেন আমার কাঁধে। সবাই মিলে ধরাধরি করে যখন কাকিমাকে আলাদা করল, তখন আমার কাঁধের বেশ কিছুটা মাংস কাকিমার মুখে। ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। তিনি হাসিমুখে মহানন্দে সেই মাংস চপচপ শব্দে চিবোচ্ছেন।

কাকিমা আর বাঁচেননি। সেই রাতেই মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠে কাকিমা মারা যান। তাঁর প্রিয় মানুষ যে কাকা নন, আমি, সেটা বুঝতে পারেননি বলে মা অনেকদিন অবধি আক্ষেপ করেছিলেন। কাকাও পরদিন থেকে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান, কেউ তাঁর খবর পাননি। অনেকে বলেছিল, “পাপের শাস্তি।” তারপর ওঝা এসে একদিন আমাকে ঝাড়ালেন। তিনমাসেরও বেশি দিন লেগেছিল ঘা পুরো শুকাতে। সেটা অবশ্য ডাক্তারের কৃপা। মা বলতেন যমে মানুষে টানাটানি। বেঁচে যাওয়ার পর আমার প্রফুল্লকুমার নাম বদলে বলহরি রাখা হয়। বলহরি... যমের অরুচি।”

ঠাকুর্দা নব্বই বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর কাঁধের কাছে সেই অদ্ভুত ক্ষত আমিও দেখেছি। বলতেন গাছ থেকে পড়ে গিয়ে। এখন মনে পড়ছে... দেখলে মনে হয় কেউ যেন প্রবল হিংসায়, রাগে একটানে একদলা মাংস খুবলে নিয়েছে।

লেখকের জবানি : ঠাকুর্দার কাছে শীতসন্ধ্যায় যখন গল্প শুনতে চাইতাম, তার বেশিরভাগই ছিল ভূতের গল্প। গল্পের প্রথম দিকের সবকটা কথা সত্যি। বলহরি নাম ছিল তাঁর। উদ্বাস্তু হয়ে এ দেশে এসেছিলেন। গল্প শুনতে চাইলে তাই ফেলে আসা দেশের নানা গল্প শোনাতেন। এই গল্পের কিছু কিছু ঘটনা তাঁর মুখে শোনা, তিনিও অন্য কারও মুখে শুনেছেন ছোটোবেলায়। এখানে শল্ল আর চঞ্চুর হাড় নিয়ে যা বলা আছে, তার কিছু পড়েছি যমদত্তের ডায়রিতে আর কিছু ঠাকুর্দার মুখে শোনা। বিভূতিভূষণ বা হেমেন্দ্রকুমার আমাদের যে ঘরানার গল্প শুনিয়ে গেছেন, তা থেকে ইদানীং আমরা অনেকটাই সরে গিয়ে সাইকোলজিক্যাল হররের দিকে ঝুঁকেছি। তাই চেষ্টা করলাম সেই ক্লাসিক স্টাইলে কিছু লেখার। এই গল্পের কিছুটা সত্যি বলে দাবি করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা, কিছুটা আমার কল্পনা আর বাকিটা? বাকিটা পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম...

অভিশাপ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদিত বিখ্যাত 'সন্ধ্যা' পত্রিকার একটা সংকলন ইদানীং হাতে এসেছে। সেটাই উলটেপালটে দেখছিলাম। বিভিন্ন বিষয়ে দারুণ সব লেখার সঙ্গে একটা লেখায় চোখ আটকে গেল। একটা সম্পাদকীয় নিবন্ধ। নাম 'পানিহাটির অপদেবতা'। সম্পাদকীয় লেখাটা অদ্ভুত। তাতে লেখা ১৩১২ সন, মানে ১৯০৫ নাগাদ কোজাগরী পূর্ণিমার তিন দিন পর 'পানিহাটিতে এক অপদেবতার ভয়ানক উপদ্রব হয়'। কোন এক হীরেন্দ্রনাথ বসাকের উপরে এই অপদেবতার ভরে এমন কিছু একটা হয় 'যাহা কহিতে গেলে শোনিত শুখাইয়া আসে।' সম্পাদক ধরেই নিয়েছেন ঘটনাটি মুখে মুখে প্রচলিত হওয়ায় এর কাহিনি বিস্তারিত সবাই জানেন। তাই তিনি বিশেষ বর্ণনা দেননি। তাতেও ভয়াবহ এক আতঙ্কের ছাপ রয়েছে গোটা লেখা জুড়ে। ঠিক কী হয়েছিল না জানতে পারলে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ আকাশের কথা মাথায় এল। আকাশ আমার বন্ধু। কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। ওদের আদি বাড়ি পানিহাটি। এখন অবশ্য সপরিবারে কল্যাণীতে থাকে। ওঁর বাবা ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। এখনও প্রচুর পড়াশোনা করেন। উনি কিছু জানলেও জানতে পারেন।

আকাশকে ফোন করায় কিছু সময় গেল ওর রাগ ভাঙাতে, কেন এতদিন ফোন করিনি। একথা সেকথা বলার পর সরাসরি কাজের কথায় এলাম।

— আচ্ছা আকাশ, কাকুকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারবি?

— কী কথা?

— অনেকদিন আগে, মানে ধর তোর ঠাকুর্দার জন্মেরও আগে, পানিহাটিতে একবার এক অপদেবতার উপদ্রব হয়। সে ঘটনা এতটাই সাড়া ফেলেছিল যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তা নিয়ে একটা সম্পাদকীয় লিখে ফেলেছিলেন। কাকুকে একটু জিজ্ঞেস কর তো, কাকুর কোনও আইডিয়া আছে কি না এই ব্যাপারে..

— দাঁড়া বাবাকে দিচ্ছি... বলেই আকাশ খানিকক্ষণের মধ্যে কাকুকে ডেকে দিল। কাকুকে গোটা ব্যাপারটা বলায় কাকু খানিক চুপ। তারপর খুব ধীরে ধীরে বললেন, "তুমি একবার আমাদের বাড়ি আসতে পারবে? সব কথা ফোনে হয় না। তুমি এসো, আমি তোমায় সব বলব।"

পরের সপ্তাহেই এক রবিবার করে আকাশ দের সেন্ট্রাল পার্কের পাশের দোতলা বাড়িতে আমি উপস্থিত। গিয়েই দেখি জলখাবার তৈরি। লুচি, ছোলার ডাল, মিষ্টি। কাকিমা মারা গেছেন বছরখানেক হল। বাড়িতে এখন কাকু, আকাশ , আকাশের বউ রিনি আর ছোট্ট ছেলে ঋক। খেতে খেতেই প্রশ্ন করলাম, "কাকু, সেই ঘটনাটা বললেন না তো?"

কাকুর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। কী যেন ভেবে তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "এতদিন আমি এই ঘটনাটা কাউকে বলিনি। বাবুকেও না (বাবু আকাশের ডাকনাম)। বাবুর মা জানত। ভেবেছিলাম কাহিনিটা সঙ্গে নিয়েই চিতায় উঠব। ভুলেই গেছিলাম প্রায়। সেদিন তুমি ফোন করায় চমকে উঠলাম। আমার বাবা বলেছিলেন যেন তেন প্রকারেণ এই কাহিনি নাকি পরিবারের সাত পুরুষ অবধি বিস্তার পাবেই। আমি বিশ্বাস করিনি। এখন বুঝছি, আমি বন্ধ করতে চাইলেও এই কাহিনিকে আটকানো

মুশকিল। গত কয়েকদিন অনেক ভেবেছি। তারপর ঠিক করলাম নিয়তিতে আমার হাত নেই। নইলে তুমিই বা ওই লেখা পড়বে কেন, আর পড়ে আমাকেই বা ফোন করবে কেন?”

আমি বেশ অবাক। আকাশ আর রিনির মুখ দেখে বুঝলাম ওরাও হতবাক হয়ে চেয়ে আছে। কেউ একটা কথাও বলছে না। পাশের ঘরে ঋক একা একা মায়ের ওড়না নিয়ে খেলছে আর বকবক করছে। ঘরে আওয়াজ বলতে ওইটুকুই।

“পানিহাটির অপদেবতার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক এক অভিশাপ জড়িয়ে আছে। সেই কাহিনিই বলব তোমাদের। আমার ঠাকুরদার বাবা কিশোরীমোহন মুখুজ্জে ছিলেন ভয়ানক ডাকাবুকো মানুষ।”

“কিশোরীমোহন মানে রোনাল্ড রসের সেই সহযোগী, যাঁকে ব্রিটেনে সোনার মেডেল দিয়েছিল?”

“উনি বাঁড়ুজ্জে। হাংরি আন্দোলনের মলয় রায়চৌধুরীর দাদু। পানিহাটির নিলামবাটি ছিল ওঁদের বাড়ি। আমার ঠাকুরদার বাবার বন্ধু। আমাদের ছিল মশলা আর তামাকের ব্যবসা। নদীপথে যশোরের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। পানিহাটি তো ব্যবসারই জায়গা। সংস্কৃত পণ্যহট্ট বদলে এই নাম হয়েছে।”

বুঝলাম কাকু এবার ইতিহাসে ঢুকে যাচ্ছেন, তাই আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনতে বললাম, “কাকু যেটা বলছিলেন...”

উনি আবার সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, “হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ঠাকুর্দার বাবা ব্যবসা দেখতেন বটে, তবে ব্যবসায় তাঁর মন ছিল না। বরং কোথায় কীর্তন হচ্ছে, কোথায় যাত্রাপালা হবে, কাকে শ্মশানে নিতে হবে এই নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল দেখার মতো। কাজ দেখতেন হিরু বসাক নামে এক নায়েব। তাঁর আসল নাম আমি জানি না। হিরুই শুনেছি। ছোটোখাটো বেঁটে মানুষ, লিকলিকে রোগা, গালে লম্বা দাড়ি। সবাই ঠাট্টা করতেন, হিরুবাবুর দাড়ির ওজন ওঁর থেকে বেশি। তবে মানুষটা ছিলেন ধুরন্ধর। ব্যবসার গলিঘুঁজি তাঁর নখদর্পণে। তখন ইংরেজ আমল। আর সে আমলে ঘুষ ছাড়া কোনও কাজ হত না। কোন দেবতা কোন ফুলে তুষ্ট, কোন সাহেবকে টাকা দিতে হবে, আর কোন সাহেবকে মেয়ের জোগান দিলে খুশি হবেন, তা হিরুবাবুর মতো কেউ জানত না। কিশোরী নিজের মতো থাকতেন আর বকলমে হিরুবাবুই ব্যবসার মালিক ছিলেন। হিরুবাবুর নিজের চরিত্রদোষ ছিল না। কিন্তু আশেপাশের গাঁয়ের বিবাহিত মহিলাদের ফুসলে সাহেবদের ভোগ হিসেবে পাঠানোর জন্য তাঁকে কেউ দুচোখে দেখতে পারত না। ব্যতিক্রম কিশোরীমোহন। সব জেনেশুনেও তিনি হিরুকে প্রশ্রয় দিতেন। তার একটাই কারণ, সেরেস্তা থেকে যখন খুশি টাকা নিয়ে তিনি দুহাতে খরচা আর আমোদআহ্লাদ করতে পারতেন। এ সুযোগ নিজে দায়িত্ব নিলে সম্ভব না। এদিকে তলে তলে হিরুর শত্রু বাড়ছিল। তিনি সঙ্গে দুজন লেঠেল নিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করলেন। বাড়াবাড়ি হল ১৯০৫ সালের পুজোর ঠিক আগে আগে। পুজোতে ম্যাকগ্রেগর সাহেবকে ভেট পাঠাতে হয়। তা না হলে ব্যবসার দাদন পেতে মুশকিল হবে। এবারের ভেট হিরু অনেকদিন ধরেই ঠিক করে রেখেছিলেন। গোয়ালাপাড়ায় রাধু নতুন বিয়ে করেছে। তার বউ কমলা যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। বয়স এখনও পনেরো পেরোয়নি। ডাঁসা যৌবন। এক রাতের জন্য একে পেলে সাহেব গোটা এক বছরের দাদন লিখে দেবে। মুশকিল হল একটাই। কমলা রাধুকে ভয়ানক ভালোবাসে। আর রাধুও কমলাকে। রাধুর শরীরে হাতির বল। সা-জোয়ান চেহারা। শুধু একটাই দোষ। সন্ধে হলেই ধেনো মদের বোতল খুলে

বসে। হিরুবাবু জানতেন মদ খেলে লোকের তাল ঠিক থাকে না। একদিন রাধুকে ডেকে আদর করে গলা অবধি মদ খাওয়ালেন। রাধু অতটা তলিয়ে ভাবেনি। এদিকে হিরুর লেঠেলরা কমলাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল আগরপাড়ায় সাহেবের ডেরায়। কমলা আর ফেরেনি। কেউ বলে সাহেবের রক্ষিতা হয়ে গেছে। কেউ বলে হিরু তাকে সোনাগাজির গলিতে নিয়ে বেচে দিয়েছে। আবার কেউ বলে আগরপাড়ারই এক গাছের ডালে ঝুলে পড়েছে। রাধু আর তার বাবা হরি কিশোরীর কাছে নালিশ জানাল। তিনি সব বুঝলেন, কিন্তু হিরুকে চটাতে পারলেন না। হিরুকে ডাকায় সে সমস্ত অস্বীকার করল। রাধু বাবার সঙ্গে ফিরে গেল। তার চোখে অদ্ভুত এক আগুন। কিশোরী ভাবলেন সব মিটে গেছে।

তিনদিন বাদে গোটা পানিহাটি আবার নড়েচড়ে বসল। সেদিন সপ্তমী। আমাদের বাড়ি দুর্গাপুজো হত। সব সেরে হিরু বসাক বাড়ি ফিরছেন, সঙ্গে মশাল হাতে দুই লেঠেল। আচমকা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল রাধু। কিছু বোঝার আগেই হিরুর কাঁধে দিল টাঙ্গির এক কোপ। হাতের খানিকটা খুলে ঝুলতে লাগল। লেঠেল দুজন চোস্ত। সঙ্গে সঙ্গে মশাল মাটিতে ফেলেই রাধুর মাথা বরাবর দুই লাঠির বাড়ি। রাধুর মাথা ফেটে দুফালা হয়ে গেল। পরদিন সকালে গিয়ে সবাই দেখল রাধুর মাথা মাঝবরাবর ফাটা। ফুলকপির মতো সাদা সাদা ঘিলু এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। পুলিশ এল। কিন্তু কিশোরীর পয়সার জোর ছিল। কোনও সাক্ষী না থাকায় পুলিশ এজাহারই নিল না।

তবে হিরুর অবস্থাও দিন দিন খারাপ হচ্ছিল। কলকাতা থেকে সাহেব ডাক্তার এসেও সুবিধে করতে পারলেন না। কাটা জায়গা পচে ঘা হল। সেই ঘা বেড়ে সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ল। কোজাগরী পূর্ণিমার তিনদিন পর সন্ধ্যাবেলায় হিরু বসাক মারা গেলেন। তিন কুলে হিরু বসাকের কেউ ছিল না। ফলে কিশোরী ঠিক করলেন তিনি আর তাঁর বন্ধুরাই কাঁধ দিয়ে হিরুকে শ্মশানে নিয়ে যাবেন। মারা যাবার পরে দেখা গেল হিরুর গোটা শরীর ফুলে জয়ঢাক হয়ে গেছে। বেঁটে মানুষ, তাই একেবারে ফুটবলের মতো লাগছে। খাটে শুইয়ে দুইদিকে বাঁশ বেঁধে আটজন পথবাহক 'হরি হরি' বোল তুলে তাঁকে নিয়ে চলল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু দূরেই একটা আশশ্যাওড়া গাছ ছিল। তার নিচ দিয়ে যেতে না যেতেই হিরুবাবু দড়ি ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এ কেমন অলক্ষণ? কিশোরী ছিলেন মড়া পোড়ানোর এক্সপার্ট। বললেন, 'দড়ি পচা। পাটের দড়িতে হবে না। নারকেলের মজবুত দড়ি আনতে হবে।' আনা হল। হিরুবাবুকে ওঠাতে গিয়ে আর-এক মুশকিল। এই সামান্য সময়ে হিরুবাবুর ওজন প্রায় চারগুণ বেড়ে গেছে। আটজন চেষ্টা করেও তাঁকে মাটি থেকে খাটে ওঠাতে পারল না। যেন কোনও অশরীরী শক্তি প্রবল বলে হিরুকে মাটিতে ঠেসে ধরে আছে। তাঁর পায়ের পাতা অবধি মাটির সঙ্গে আঠার মতো লেগে। চোখের তুলসীপাতা সরে গেছে। দুই চোখ খোলা। মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে হিরু বসাক সোজা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। শেষে গলদঘর্ম হয়ে কিশোরী ঠিক করলেন বাঁশের চালি দেহের তলায় ঢুকিয়ে শক্ত দড়িতে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে যাবেন। তাই হল। এদিকে এসব করতে করতে প্রায় মাঝরাত হয়ে গেছে। মৃদু কণ্ঠে হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে আটজন চলেছে। পিঠের মড়া যেন ক্রমশ আরও ভারী হচ্ছে। পা আর চলতে চাইছে না। এদিকে পথও ফুরোচ্ছে না। কিশোরীর বন্ধু ভোলানাথের বাবা ছিলেন তান্ত্রিক। সে ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ ভাই, হিরু বসাককে দানোয় পায়নি তো!'

এই কথায় সবাই একসঙ্গে শিউরে উঠল। সবারই মনে হয়েছিল। এতক্ষণ মুখ ফুটে কেউ বলতে পারেনি। দানো কোনও ভূত নন। ইনি অপদেবতা। অ-শরীরী। দানোকে কেউ কোনও দিন দেখেনি। কোনও মৃত ব্যক্তি মহাপাপ করে মরলে দানো তার দেহ আশ্রয় করে। দানোয় পেলে দেহ দশগুণ অবধি ভারী হয়, যমদূতরা তার দেহ হেঁচড়ে

হেঁচড়ে যমালয়ে নিয়ে যায়। আর তাতে কেউ বাধা দিলে মহাপাপ। সেই পাপ যে কী কেউই ঠিক জানে না।

কিশোরী এই সবই শুনেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করতেন না। এক মুহূর্তের জন্য ভয় পেলেও তিনি সবাইকে ধমক দিলেন, 'থাম দিকি। লজ্জা করে না তোদের? বুড়োদের মতো কতা কইছিস? এসব দানো-ফানো কিচ্ছু নেই। এসব তোদের ভ্রেম। হিরু বসাকের শরীল পচে গেচে, তাই ওজন বেড়েচে।'

পথ একসময় শেষ হল। সাধারণত তিন মন কাঠে লোকজনকে দাহ করা হয়। হিরুর জন্য আরও দুই মন নেওয়া হল। চিতা সাজানো হচ্ছে। শববাহকরা হুঁকায় কড়া দা-কাটা তামাক টানছে, দুইজন পাশেই মামার দোকানে ধেনো মদ খেতে গেছে, এমন সময় কিশোরীই খেয়াল করলেন মড়ার দেহটা ধীরে ধীরে বেঁকে যাচ্ছে। ধনুকের মতো। ভোলানাথ একদৃষ্টে ভয়ে ভয়ে সেদিকেই তাকিয়ে ছিল। গোটা দেহ চালিতে বাঁধা। শুধু মাথা আর পা মাটি থেকে খুব আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। কিশোরী ডোমকে বকাবকি শুরু করলেন তাড়াতাড়ি মড়া পোড়ানো শুরু করার জন্য। ডোম চিতা সাজিয়ে দিল। অতি কষ্টে হিরুকে চিতায় তোলা হল। কিশোরীই মুখাগ্নি করবেন। তার আগে মড়ুইপোড়া বামুন মন্ত্র বলতে বলতে পিণ্ড রাঁধছেন, এমন সময় হঠাৎ হিরুবাবু চিতার উপরে খাড়া হয়ে বসলেন। এই দৃশ্য দেখে যে যেদিকে পারে ছুট দিল। শুধু বামুন পিণ্ড ফেলে জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। হিরুবাবুর ঘাড় গেল ঘুরে। তিনি সোজা তাকালেন কিশোরীর দিকে। তারপর জিভ বার করে কী একটা শব্দ করলেন। আর তারপরেই মনে হল প্রবল বেগে কারা যেন হিরুর পা ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে চলেছে। চিতা ভেঙে গেল। হিরুর মৃতদেহ প্রবল বেগে শ্মশানের পাশের জঙ্গলের দিকে ধেয়ে চলল। কিশোরী খানিক থ হয়ে গেছিলেন। তারপর তিনিও পিছন পিছন ছুট লাগালেন। বামুনঠাকুর যতটা দেখলেন, কিশোরী প্রাণপণে হিরুর চুলের মুঠি ধরে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করছেন। তারপর দুজনেই জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

আধঘণ্টা বাদে সবাই ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে। ভাঙা চিতার সামনে সেই বামুন বসে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন। ভোলানাথ সহ বন্ধুরা জিজ্ঞেস করায় বামুন সব খুলে বললেন। কিন্তু কিশোরী গেলেন কোথায়? তাঁকে তো খুঁজতে হবে। প্রথমে কেউ জঙ্গলে এত রাতে যেতে রাজি হল না। শেষে ভোলাই সবাইকে বোঝাল। লণ্ঠন, মশাল নিয়ে সবাই কিশোরীকে খুঁজতে জঙ্গলে ঢুকল। আকাশে মেঘ করেছিল অনেকক্ষণ। এখন টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হল। মশাল গেল নিভে। শুধু ঢাকা লণ্ঠনের আবছা আলো। জঙ্গলে খানিক যাবার পর একটা জায়গায় ঝোপঝাড় দুমড়ে মুচড়ে আছে। যেন কেউ ভারী কিছু টেনে নিয়ে গেছে। দলের সবাই সেই পথেই রওনা হল। খানিক যাবার পর জঙ্গল কিছুটা হালকা। গাছপালা কম। আর সেখানেই ঢাকা লণ্ঠনের অল্প আলোয় তারা যা দেখতে পেল, তাতে তাদের রক্ত হিম হয়ে গেল। জঙ্গলের মাঝে চিত হয়ে শুয়ে আছেন কিশোরী আর ঠিক তাঁর উপরে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো উবু হয়ে তাঁর পেটের থেকে মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে একটা প্রাণী। এ প্রাণী অনেকটা মানুষের মতো। অনেকটা হিরু বসাকের মতো। কিন্তু মানুষ না। মানুষের অমন ধারালো দাঁত থাকে না। মানুষের চোখ আলো পড়লে ওরকম জ্বলজ্বল করে না। কিশোরী দানোকে বাধা দিয়েছিল। কিশোরীকে দানো তাই চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে।

এই ঘটনার দুইদিন পরেই কিশোরীর বড়ো ছেলে পুকুরে ডুবে মারা যায়। আমার বাবা তখন সবে এক বছর। ঠাকুমা পানিহাটি ছেড়ে কলকাতায় বাপের বাড়ি চলে আসেন। বাবা

কলকাতাতেই বড়ো হন। বিয়ে করেন। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই ছেলে হয়। দুই বছর হতে না হতে ছাদের রেলিং ভেঙে পড়ে সে ছেলে মারা যায়। স্পট ডেড...। বাবা আমাকে এই গল্পটা বলেছিলেন। আমিও বড়ো হই। বিয়ে করি। কাজল জন্মায়। একদিন বোতলে করে দুধ খেতে খেতে আচমকা ওর দমবন্ধ হয়ে গেল। কিছু বোঝার আগেই সব শেষ। আকাশ জন্মাল তার বছর দু-এক বাদে। ওকে আজ অবধি কিছু বলিনি... বলতামও না... যদি না তুমি সবটা আবার খুঁচিয়ে তুলতে..."

সবাই চুপ। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে রিনি "ঋকের কোনও আওয়াজ পাচ্ছি না কেন?" বলেই দৌড়ে পাশের ঘরে গেল, আর গিয়েই চিৎকার করে বলল, "এদিকে এসো শিগগির।"

আর্তনাদেই মনে হল ভয়াবহ কিছু ঘটেছে। আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম। খাটের উপরে ফ্যান। ফ্যান থেকে ঝুলছে রিনির ওড়না, আর ওড়না থেকে ঝুলছে ছোট্ট ঋক। তার চোখ খোলা। পলক পড়ছে না...

লেখকের জবানি : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদিত বিখ্যাত 'সন্ধ্যা' পত্রিকার একটা সংকলন সত্যি আমার হাতে এসেছিল। সেখানে খবরটাও সত্যি। অপদেবতাদের নিয়ে লেখার ইচ্ছে অনেকদিন ধরেই। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে। দানোকে নিয়ে তথ্য পেয়েছি যমদত্তের ডায়রি থেকে। বাকিটা কল্পনা।

মরণের পরে

১

কনকনে ঠান্ডায় আচমকা শিউরে উঠল প্রাণকৃষ্ণ। খুব ছোটোবেলায় মাঘের শীতে যখন লেপ গায়ের থেকে সরে যেত, তখন অনেকটা এইরকম মনে হত। প্রথমেই চিনচিন করে উঠল পায়ের আঙুলগুলো। তারপর শিরদাঁড়া বেয়ে কনকনে একটা ঠান্ডা মাথার খুলি অবধি কাঁপিয়ে দিল একেবারে।

চারিদিক অন্ধকার। প্রাণকৃষ্ণ খানিকক্ষণ বুঝতেই পারল না ও কোথায়। ভেবলে-টেবলে শুয়ে রইল খানিক। ও শুয়েই আছে। কোনও একটা বাক্স ধরনের লম্বাটে জিনিসে। লোহার তৈরি। কিন্তু ও এখানে এল কী করে? কিচ্ছু মনে নেই। ওকে কি কেউ ধরে আনল? শেষ মনে থাকা অবধি ও হাবুলের ঠেকে বসে দেদার বাংলা খাচ্ছিল। সঙ্গে ঝাল ঝাল চানাচুর আর আলুর চপ। হাবুল বলছিল, “সকাল সকাল আর বেশি টেনো না, পানুদা... শরীলে সইবে না।” ও শোনেনি। শেষটায় পেটটা কেমন গুলিয়ে উঠল আর বমি শুরু। কী বমি... কী বমি। দুজন মুশকোমতো লোক অনেক চেষ্টা করেও ওকে ধরে রাখতে পারছিল না। পেটের নাড়িভুঁড়ি যেন ঠেলে বেরুতে চাইছে। তারপর ওর শরীর ছেড়ে দিল। ওরা ধরাধরি করে ওকে একটা বাঁশের খুঁটিতে ভর দিয়ে বসাল। ওর আর কিচ্ছু মনে নেই...

প্রাণকৃষ্ণর গায়ে পাতলা একটা চাদর। কিন্তু যা ঠান্ডা এতে কিস্যু লাভ হচ্ছে না। এবার হাতের আঙুলগুলো কুঁকড়ে আসছে। শালারা ফ্রিজের মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিল নাকি? এটা মনে হতেই প্রাণকৃষ্ণ আবার কেঁপে উঠল। তবে এবার শীতে না। ভয়ে। ও কি তাহলে মারা গেছে? যমদূতরা ওকে ধরাধরি করে নরকে নিয়ে এসেছে? সারা জীবনে যা পাপ করেছে, তাতে সে স্বর্গে যাবে না এই বিষয়ে প্রাণকৃষ্ণ একরকম নিশ্চিন্তই ছিল। অন্যের টাকা মারা, পাশের বাড়ির মিনতির বর বাড়ি না থাকলে চুপিচুপি ঘরে ঢুকে সারা দুপুর ফুর্তি করা, মদ, মাংস, মেয়েছেলে, বাকিটা কী রেখেছে? কিন্তু তা বলে নরক যে এমন হয়, সেটাও ওর ধারণা ছিল না। সেখানে নাকি গরম কড়াইতে ফেলে তেলে ভাজে। এখন যা ঠান্ডা লাগছে, তাতে সেটা বরং ভালো বোধ হচ্ছে। প্রাণকৃষ্ণ একটু দুঃখ পেল। যতদিন বেঁচে ছিল নরক নিয়ে ভুল একটা ধারণা ছিল তার। পৃথিবীর মানুষের এখনও তাই আছে। এই যে বলাইয়ের বাবা, এত কিছু জানে, সেও তো এটা জানে না। কিন্তু ফিরে গিয়ে যে শুধরে দেবে সে উপায়ও নেই।

ভাবতে ভাবতে আশেপাশে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল যেন। ওই বুঝি যমদূতরা এল...

২

রজত আর সুমন দুজনেই বেশ উত্তেজিত। কাউকে না জানিয়ে রাত দুটোয় ওরা কাঁটাপুকুর মর্গে এসেছে। দুজনেই সার্জারির ছাত্র। কিন্তু বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া এখন এত ঝকমারি হয়েছে যে নিজেদের মতো করে শেখা মুশকিল। পঞ্চাশ জন একটা মড়াকে ঘিরে

থাকে, আর স্যার যে কী দেখান, ভালো করে দেখাই যায় না। এসব দিকে রজত বেশ চৌকশ। ইউনিয়ন করে। চেনাজানা ভালোই। ও-ই একদিন সুমনকে বলল, “কি রে, নিজের জন্য স্পেশাল মড়া চাই?”

“ধুস। কী যে বলিস! হবে নাকি?”

“হবে গুরু। তবে কিছু মাল্লু ছাড়তে হবে। কাঁটাপুকুর মর্গের ডোম হরিয়াদার সঙ্গে কথা বলেছি। বেওয়ারিশ লাশ এলেই জানাবে। আর পোস্টমর্টেমের নামে কী হয় তা তো জানিস। তার আগে আমরা নিজেদের মতো দেখেশুনে নেব। কি, চলবে?”

“চলবে তো... কিন্তু কত দিতে হবে?”

দুজনে দুহাজার টাকায় রফা হয়েছে। সকালেই খবর পাঠিয়েছে হরিয়া। একটা লাশ এসেছে। তিন কুলে কেউ নেই। বিষ মদে মারা গেছে। রাতে বডি খুলবে। রজতের বুক ঢিপ ঢিপ। সুমন সাহস দেখালেও খুব যে একটা সাহস পাচ্ছে, তা না। এত রাতে এসব জায়গায় যেন ভূতে ভর করে।

৩

মর্গে ঢুকেই হরিয়াকে দেখতে পেল তারা। লাশকাটা ঘর থেকে বেরুল। ঘরে উঁকি দিল রজত। টেবিল খালি। হরিয়ার দুই চোখ লাল। হাড়িয়া খেয়ে প্রায় মত্ত। জড়ানো গলায় বলল, “টাকাটা?” দুটো চকচকে দুহাজারের নোট পকেটে গুঁজে হরিয়া ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। হরিয়ার হাতে অনেকটা কুঠারের মতো দেখতে একটা অস্ত্র। “ওটা কী কাজে লাগে?” রজত বলল।

“বডি খুলতে।” উত্তর দিল হরিয়া।

৪

প্রাণকৃষ্ণ বেশ কয়েকবার দুর্গানাম করে নিল। যমদূতরা হাজির। এবার যা থাকে কপালে। ড্রয়ারের মতো ওর বাক্সটা কে যেন খুলে দিল। আহহ... ঠান্ডা অনেকটা কম। বাইরে জোরালো আলো। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তবু মিটমিট করে তাকিয়ে পানু সোজা উঠে বসে পড়ল। আর তা দেখেই প্রথমেই এক জান্তব চিৎকার করে উঠল রজত। তার দেখাদেখি সুমনও। দুজনেই দৌড়ে পালাল একজিট গেটের দিকে। যাবার আগে শুধু দেখতে পেল হরিয়ার নেশা কেটে গেছে। এত বছরের চাকরিজীবনে সে এমন দৃশ্য দেখেনি। তার দুই চোখ বিস্ফারিত।

৫

পরের দিন সকালে উঠে আগের গোটা রাতটাই কেমন যেন দুঃস্বপ্ন মনে হল দুজনের। কিন্তু একসঙ্গে দুজনে কীভাবে এক জিনিস দ্যাখে। হরিয়ারই বা কী হল। রজতের অনিচ্ছাতেও সেদিন দুপুরে কাঁটাপুকুরে আবার গেল ওরা। হরিয়া নেই। কে জানে কোথায় গেছে। তাহলে কি ওর কিছু হল? সুমন ভাবল। ঠিক সেই সময় চাপা গলায় রজত ওর টিশার্ট টেনে বলল, “ওই দেখ।”

সুমন দেখল লাশকাটা ঘরের খালি টেবিলটা এখন আর খালি নেই। কালকের সেই মড়াটা সেখানে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। শুধু তার করোটি বরাবর মাথাটা দুইভাগ করে দিয়েছে হরিয়ার ওই কুঠারের মতো অস্ত্রটা।

লেখকের জবানি : অহর্নিশের জন্য অ্যামব্রোস বিয়ার্সের ডেভিলস ডিকশনারি অনুবাদ করেছিলাম। তখনই তাঁর অন্য গল্পগুলো পড়ার সৌভাগ্য হয়। এই গল্পের বীজ তেমনই একটা গল্পের মধ্যে ছিল।

প্রেতিনী

আমি শুভদীপ। শুভদীপ সরকার। বাবার নাম শুভাশিস সরকার। মা জয়ন্তী সরকার। আমি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। আমার এক বোন ছিল। জয়িতা সরকার। তিন বছর আগে বোন মারা গেছে। আমি বাবা মায়ের সঙ্গে থাকি না। হোস্টেলে থাকি। একা। বাবা কথা দিয়েছিল আমার চোদ্দো বছরের জন্মদিনের দিন আমাকে নিতে আসবে। আমাকে হোস্টেল থেকে ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে। আজ আমার জন্মদিন। বাবা আর মা দুজনেই আমাকে নিতে এসেছে। আমি ঘরে নিজের জিনিস গুছাচ্ছি। মা আমাকে হেল্প করছে। বাবা রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কথা বলছে।

"আপনি শিওর? ওকে নিয়েই যাবেন?" ওয়ার্ডেন বললেন।

"দেখুন, হাজার হোক একমাত্র ছেলে। ওকে ছেড়ে থাকতেও তো পারি না। আমি তো তবু অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকি। ওর মায়ের কথা ভাবুন... সারাদিন একা একা..."

"তা বটে। কিন্তু আর কিছুদিন... যাই হোক, যা ভালো বোঝেন।" বলে ওয়ার্ডেন চলে গেলেন।

মা আমার বইগুলো গুছাচ্ছিল। হঠাৎ দেখি আমার ডায়রি নিয়ে পড়তে শুরু করেছে। আর দু-এক পাতা উলটেই চিৎকার করে বাবাকে ডাকল মা।

"এই যে, কি গো! দেখে যাও তোমার ছেলের কাণ্ড!"

আমি ভাবলাম দৌড়ে গিয়ে ডায়রিটা কেড়ে নিই। তারপর দেখলাম যা দেখার মা দেখে ফেলেছে। এখন কাড়তে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

বাবা প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকল, "কেন কী হয়েছে?"

"এই দ্যাখো! তোমার ছেলে... দিনরাত ডায়রিতে এসব করছে।"

লাল কাপড়ে বাঁধানো ডায়রিটা আমাকে বাবা কিনে দিয়েছিল। গতবার জন্মদিনে। এখানের প্রতিদিনের রোজনামচা লেখার জন্য। কিন্তু তা বলে কি আমি নিজের রিসার্চের কাজ এতে লিখতে পারব না! কী জানি বাবা।

বাবা খুব গম্ভীরভাবে ডায়রির পাতা ওলটাতে লাগল। একটা করে পাতা ওলটাচ্ছে, আর আমার দিকে তাকাচ্ছে। গোটা দশ পাতা উলটে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "এসব কী বাবুন?"

"আমার রিসার্চের কাজ", গম্ভীর মুখে জবাব দিলাম।

"রিসার্চ! তুমি আজকাল এইসব নিয়ে রিসার্চ করছ? এসব কী? ব্রহ্মরাক্ষস। জটেবুড়ি। কন্ধকাটা। ঘর দেবত্তি। প্রেতিনী। কারা এরা?"

"তুমি জানো বাবা। খুব ভালো জানো। এঁরা অপদেবতা। তোমাকে আগেও বলেছি।"

"এসব গাঁজাখুরি বিশ্বাস করো তুমি? যত্তসব আষাঢ়ে গপ্পো!"

"গপ্পো না বাবা। এঁরা আছেন। আমাদের মধ্যেই। যেমন তুমি-আমি..."

"এসব কে শেখাচ্ছে তোমায় বলো তো?" বাবা এবার প্রায় চিৎকার করে বলল, "কোথা থেকে জানছ এই সব?"

"বই পড়ে। আমাদের তো দিনে এক ঘণ্টা লাইব্রেরি অ্যালাউড।"

"আর সেখানে বসে তুমি এইসব পড়ো!!" রাগে বাবার গলা এবার প্রায় ধরে এল। মা বাবাকে থামাল।

"তুমি আর উত্তেজিত হোয়ো না। এবার তো বাড়িতেই থাকবে। আমি দেখছি কী করা যায়।"

"দেখো", ডায়রিটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে বাবা বলল, "তোমার কথায় এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার দায়িত্ব।" বলে বাবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ করল দমাস করে।

আমি কিছু বললাম না। শুধু মাটি থেকে ডায়রিটা কুড়িয়ে পিঠের ব্যাকপ্যাকে রেখে দিলাম।

বেরোতে বেরোতে বিকেল হয়ে গেল। বাবা আজকে নিজে ড্রাইভ করছে। পাশে মা। আমি পিছনের সিটে একা বসে আছি। মা হাতব্যাগ থেকে একটা কেক বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "খেয়ে নে। বাড়ি যেতে যেতে দেরি হবে।"

"কেন?"

"একটু লাল্টু কাকুর বাড়ি যাব। বাড়ি মানে নতুন বাড়ি। ওরা বিরাটিতে একটা নতুন বাড়ি কিনেছে। এখন আর হাবড়ায় থাকে না। অনেকদিন ধরে আমাদের বলছে যেতে। যাওয়া হচ্ছে না। তোর বাবা বলল আজ যখন পাশ দিয়েই যাব, তো ঘুরেই আসি। বেশিক্ষণ না। ঘণ্টাখানেক থাকব। ফেরার পথে বারাসাত, মধ্যমগ্রামে প্রচুর ভালো দোকান আছে। ডিনার করে নেওয়া যাবে।"

আমি কিছু বললাম না। গাড়ি এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমি অনেকদিন পরে এভাবে সন্ধ্যা নামা দেখছি। হোস্টেলে সন্ধ্যার আগেই নিজের নিজের রুমে ঢুকে যেতে হয়। আমার ঘরের জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যেত না। আকাশ প্রথমে কমলা, তারপর গোলাপি হয়ে অদ্ভুত ছাই ছাই রং নিল। সব গাড়ি ধীরে ধীরে হেডলাইট জ্বালাচ্ছে।

বিরাটি ব্রিজের পাশ থেকে বাবা গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা নিল। এদিকে রাস্তা বেশ ভাঙা। এবড়োখেবড়ো। খানিক যাবার পর আবার ডান দিক, বাঁ দিক ঘুরে গাড়ি একটা সরু গলিতে গিয়ে ঢুকল।

"তুমি ওদের বাড়ি চেনো?" মা জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, আগে একবার এসেছিলাম লাল্টুর সঙ্গে। বাড়ি দেখতে। তখনও কেনেনি। তিন চার বছর বাড়িটা পড়ে ছিল। কেউ কিনছিল না। ও প্রায় জলের দরে পেয়ে গেছে। নইলে এই পজিশানে, এত সস্তায়, সম্ভব?"

"কিনছিল না কেন?"

"আরে লোকজনের কুসংস্কার বোঝো না? কে যেন এই বাড়িতে মারা গেছিল, সেই থেকে এই বাড়িতে নাকি..." বাবা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি পিছনে আছি বুঝে একেবারে চুপ মেরে গেল। মা আর ঘাঁটাল না।

গাড়ি এসে থামল বেশ পুরোনো একটা বাড়ির সামনে। দোতলা বাড়ি। নতুন করে রং করাবে বলে দেওয়াল ঘষা হয়েছে। বাড়ির সামনে ছোটো বারান্দা। কিছু জংলা গাছ ইতিউতি গজিয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম ভ্যাপসা গরম পড়েছে। এতক্ষণ ভিতরে এসির জন্য বুঝতে পারিনি। লাল্টুকাকু বাড়ির সামনেই মিস্তিরিদের সঙ্গে কথা বলছিল। আমাদের দেখেই হাসিমুখে এগিয়ে এল।

"কী ব্যাপার মাস্টার শুভদীপ! কতদিন পরে দেখলাম তোমাকে! এখন তো আর মাস্টার না, মিস্টার বলতে হবে। এসো এসো ভিতরে এসো। তোমার কাকিমা অনেকক্ষণ ওয়েট করছে।"

বাড়ির চৌহদ্দিতে পা দিতেই কেমন একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরল আমায়। মনে হচ্ছিল আড়াল থেকে কে যেন আমায় দেখছে। এটা আরও বাড়ল বাড়িতে ঢোকার পর। বাইরে অমন গরম, ভিতরে কিন্তু বেশ ঠান্ডা। চিনচিনে। বাবা তো বলেই ফেলল, "তোদের বাড়ির ভিতরে তো খুব ঠান্ডা! এসি লাগে না বোধহয়।"

"আসলে অনেক পুরোনো বাড়ি তো। মোটা মোটা দেওয়াল। ছাদে কড়ি বরগা দেখছিস না... আর এসি কী বলছিস, শেষরাতে রীতিমতো চাদর গায়ে দিতে হয়।"

হাসিমুখে দোতলা থেকে নেমে এল লাল্টুকাকুর বউ। আমাদের হাতে ধরে নিয়ে গেল উপরে। "তুমিই শুভদীপ! তোমার কথা অনেক শুনেছি। আজ দেখা হল।"

কাকু বিয়ে করেছে বছর দু-এক হল। বিয়েতে আমি আসতে পারিনি। কাকিমার সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা।

দোতলায় ঠান্ডাটা অদ্ভুতভাবে আরও বেশি। এমন হবার কথা না। নিচতলাই সাধারণত বেশি ঠান্ডা হয়। আর একটা অদ্ভুত গন্ধ। গোটা দোতলা জুড়ে। আঁশটে। দমবন্ধ করা।

দোতলাতেই বসার ঘর। বাবা মা সোফায় বসল। আমি একটা মোড়া টেনে বসলাম। কাকিমার মুখটা হাসি হাসি। মনে হচ্ছে জোর করে হাসবার চেষ্টা করছে। আমাকে একের পর এক প্রশ্ন করল। কী ভালোবাসি, হবি কী, বন্ধু আছে কি না। আমি হুঁ হ্যাঁ করে জবাব দিলাম। কাজের লোক জলখাবার নিয়ে এল। মাছের প্যাটিস, আর কেক। প্যাটিসটা অদ্ভুত ঠান্ডা। আর আঁশটে গন্ধ। দুই কামড় খেয়ে সরিয়ে রাখলাম। বাবারা দিব্যি খাচ্ছে। আমায় জিজ্ঞাসা করতে বললাম খিদে নেই।

এবার বাড়ি দেখানোর পালা। কাকুদের বেডরুমের পাশের রুমটা তালাবন্ধ। মা জিজ্ঞাসা করতেই কাকিমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। শুনলাম ওই ঘরেই নাকি আগের মালিকের বউ থাকতেন। একবার দীপাবলির দিন রাতে তাঁর প্রসবযন্ত্রণা ওঠে। ওই সময় ডাক্তার পাওয়া মুশকিল। সব ব্যবস্থা করার আগে এই ঘরেই বউটি মারা যায়। নাম ছিল নেহা গুপ্তা। বিহারি। বেনিয়া। আমি এবার সত্যি সত্যি চমকে উঠলাম। দীপাবলির রাতে সব প্রেতেরা নরক থেকে মর্তে উঠে আসে। আমি পড়েছি। সেই রাতে কোনও সধবা মহিলা প্রথম সন্তান হবার সময় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মারা গেলে তার কোনও গতি কেউ করতে পারে না। গয়ায় পিণ্ড দিলেও না। সে প্রেতিনী হয়ে সেই ঘরে এঁটে বসে থাকে। অবশ্য বেশিদিন না। মাঝে মাঝেই তাঁর খিদে পায়। তখন ঘরে জ্যান্ত কেউ ঢুকলে প্রেতিনী তাকে বাহন করে ঘুরে বেড়ায়। তার আত্মার অংশ চুষে চুষে খায়, যতক্ষণ না সেই লোক শুকিয়ে মরে যাবে। আমি এই সমস্ত জানি।

বাবা আমার দিকে তাকিয়েই বুঝেছিল গোলমাল। জানি না আমার ভয় কাটানোর জন্য কি না, বাবা বলে উঠল, "আমি ওই ঘরটা দেখব।" কাকিমা ইতস্তত করে কাকুর দিকে

তাকাল। কাকু বাবাকে বারবার করে বলল, "ছাড় না! এই ঘরটাই দেখতে হবে? কী দরকার?"

বাবা জোর করতে লাগল। শেষে কাকু বলল, "ঠিক আছে। আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। কিন্তু আমরা কেউ যাব না। তুই একা ঢোক।"

বাবা বলল, "আমিও ঢুকব, বাবুনও ঢুকবে। ওর মাথার থেকে এসব পাগলামো দূর করতে হবে।"

মা অনেকবার মানা করল। বাবা শুনল না। কাকু দরজা খুলে দিলে আমাকে কলার ধরে প্রায় টেনেহিঁচড়ে ঘরে ঢোকাল বাবা। আমি ঢুকতে চাইনি। ঘরের ভিতর এত ঠান্ডা, যেন এসি চালানো। আঁশটে গন্ধটা দম বন্ধ করে দিচ্ছে। বাবা এদিক ওদিক হাতড়ে বালবের সুইচ জ্বালাল। ফাঁকা ঘর। কিচ্ছু নেই। শুধু একদিকের দেওয়ালে রোগা ফ্যাকাশে মুখের এক মহিলার ছবি টাঙানো। তাতে পুরু ধুলো।

"দিব্যি ঘর। এটা ইউজ করিস না কেন? এই ঘরে একটা খাট পেতে রাখবি। সামনের বার এলে এই ঘরে আমি শোব। বাবুনকে নিয়ে। কি রে বাবুন, তাই তো?"

আমি উত্তর দিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল মাথা ঘুরে পড়ে যাব। বাবা হেসে হেসে কথা বলে যাচ্ছিল। একটা কথাও আমার কানে ঢুকছিল না। আরও ঘণ্টাখানেক থেকে আমরা বাড়ির দিকে রওনা হলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলাম লাল্টুকাকু বাবাকে বলছে, "এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই পারতি। ছেলেটা একেবারে চুপ মেরে গেছে।"

বাবা মশা তাড়ানোর ভঙ্গিতে "ছাড় তো" বলে উড়িয়ে দিল।

রাস্তায় জ্যাম। বারাসাত পৌঁছাতেই রাত নটা বেজে গেল। বাবা বলল এখানেই কোথাও খাবে। মৌচাকের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। আমার খিদে পাচ্ছিল না। বাবা জোর করছিল তাই এক পিস চিকেন দিয়ে অল্প ভাত খেলাম। সবকিছুতেই সেই অসহ্য আঁশটে গন্ধ। মাকে বললাম। মা বলল সব ঠিক আছে। দশটায় যখন খেয়েদেয়ে বেরোলাম, দেখি আকাশ মেঘে ঢাকা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কাজিপাড়া অবধি তাও রাস্তায় কিছু লরি, প্রাইভেট কার ছিল। রেলগেট পেরোনোর পরে আর কিচ্ছু নেই। বাবাও অবাক। এই সময় যশোর রোডে আর কিছু না হোক প্রচুর লরি থাকে। সেসব গেল কোথায়? আমি জানলায় মুখ ঠেকিয়ে বসে ছিলাম। দুইদিকে মাঠ। ধানখেত। দু-একটা বাড়িতে টিমটিমে আলো জ্বলছে। কোনও কারণে এদিকে লোডশেডিং। রাস্তার একটাও ল্যাম্পপোস্টে আলো নেই। বাইরের অন্ধকারে চোখ সয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

আচমকা মনে হল অন্ধকার যেন জমাট বাঁধছে গাড়ির পাশেই। একটা স্থির জমা ধোঁয়ার মতো চাপা অন্ধকার গাড়ির পাশে পাশে চলছে। আমি কাচ থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না। প্রথমে মনে হচ্ছিল দুটো লম্বা বাঁশ। ভালো করে খেয়াল করতে দেখলাম তা না। একটু দূরে দুটো রোমশ পা। তার কোমর আমাদের গাড়ির ছাদ ছুঁয়েছে। উপরে কী আছে দেখতে পাচ্ছি না। আমি দেখতে চাইও না। গাড়ির ভাঙা ভাঙা হলুদ আলোতে শুধু এটুকু বুঝলাম সেই দুই দৈত্যাকার পায়ের মালিক আমাদের গাড়ির সঙ্গে সমান বেগে হেঁটে হেঁটে চলেছে— তার পায়ের গোড়ালি দুটো পুরো উলটো।

আমি এত জোরে চেঁচিয়ে উঠেছি যে বাবা সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাতে গিয়ে মা সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

"কী হয়েছে বাবুন? এরকম অদ্ভুত চিৎকার করে উঠলি কেন?" বাবা বলল।

মা তখনও ধাতস্থ হতে পারেনি। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এদের কিছু বলা বৃথা। বিশ্বাস করবে না। মিথ্যা বললাম, "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে গেছি।"

বাবা কী যেন একটা বলতে গিয়েও বলল না। ঠিক তখনই আমাদের গাড়ির কাচে একটা টোকা পড়ল। বাবা কাচ নামাতেই গোটা গাড়ি সেই আঁশটে গন্ধে ভরে গেল। ঠিক এই গন্ধটাই আমি লাল্টুকাকুর বাড়িতে পেয়েছিলাম। এক মহিলা। বিহারি। ভাঙা বাংলায় বলল হাবড়া যাবে। কোনও বাস পাচ্ছে না। যদি একটু পৌঁছে দেওয়া হয়।

আমি বারবার মাথা নেড়ে বাবাকে মানা করলাম। কিন্তু বাবা শুনলে তো! বাবা কোনও দিন কারও কথা শোনে না। নিজের মতে চলে। বাইরে তখন বৃষ্টি বাড়ছে। বাবা হাসিমুখে পিছনের গেট খুলে দিয়ে বলল, "চলে আইয়ে।"

আমার পাশে এসে বসেছে মহিলা। গাড়ি চলছে। হালকা একটা নীল আলো গোটা গাড়ি জুড়ে। মহিলার মাথায় ঘোমটা। পরনে শাড়ি। মুখ দেখা যাচ্ছে না। ফলে বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। আমি আড়চোখে ওকে দেখছিলাম। বারবার চেষ্টা করেও ওর মুখ দেখা যাচ্ছিল না। একবার ঘোমটা একটু সরতেই মুখটা দেখে চমকে গেলাম। কোনও মানুষের মুখ এমন হয়! এই মুখ যেন আসলে কোনও মুখ না। একটা মাংসপিণ্ড। তাতে চোখ, নাক, কান, ঠোঁট কিচ্ছুটি নেই। নজর পড়ল শাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা হাতে। কালো সরু কাঠের মতো হাত। কোঁচকানো। যেন সব রস কেউ চুষে নিয়েছে। হাতের আঙুলগুলো বাঁকা আর তার ডগায় শক্ত বাঁকানো নখ। মায়ের মাথা একদিকে ঢলে পড়েছে। গাড়ি চললেই মায়ের ঘুম পায়। বাবা আপনমনে গাড়ি চালাচ্ছে আর গান গাইছে। সেই মহিলার আঙুলগুলো এবার নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। হাতের প্লাস্টিকের ব্যাগ খুলে কী যেন বার করতে চাইছে। গাড়ির আবছা আলোয় আমি দেখতে পেলাম মহিলা ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা বাচ্চার কাটা হাত বের করল। তারপর বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। হাতের কাটা অংশ থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। প্রেতিনী আমাদের পিছু ধাওয়া করেছে।

এক ঝলকে আমি দেখে নিলাম ওদিকের গাড়ির লকটা বন্ধ করতে বাবা ভুলে গেছে। মাথা ঠান্ডা করে আমার দিকের দরজায় পিঠ রেখে শরীরের সমস্ত শক্তি দিকে উলটো দিকের দরজায় মারলাম এক লাথি। সেই প্রেতিনী কিছু বোঝার আগেই ছিটকে পড়ল রাস্তায়। ঠিক তখনই উলটো দিক থেকে একটা বড়ো দশ চাকার লরি এসে ওর শরীরের ওপর দিয়ে চলে গেল।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাল। বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। বাবা আর লরির ড্রাইভার দুজনেই গাড়ি থামিয়ে অনেকক্ষণ দেখল পিণ্ড হয়ে যাওয়া দেহটাকে। তারপর বাবা ফিরে এসে খুব শান্ত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কেন এমন করলাম। আমি সব বললাম। লাল্টুকাকুর বাড়ি, প্রেতিনীর কাহিনি, সেই বিরাটাকার ওলটানো পা... সব। বাবা আমাকে বকল না। কিচ্ছু বলল না। শুধু গাড়ি ঘুরিয়ে আবার হোস্টেলের দিকে চলল।

আমি এখন হোস্টেলে নিজের ঘরে বসে আছি। বাইরে মায়ের কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাবা আর ওয়ার্ডেন কথা বলছেন। সঙ্গে আমার ডাক্তার। ডাক্তার সেন। সেনই কথা বলছিলেন, "আমার ভুল হয়েছে। স্কিজোফ্রেনিয়ার রুগি যে আসলে কোনও দিন সুস্থ হয় না তা বুঝিনি। হ্যালুসিনেশানটা তার মানে এখনও চলছে। ভেবেছিলাম এই তিন বছরে... আর ভালো ইম্প্রুভ করছিল তো! এদিকে আপনিও তাড়া দিচ্ছিলেন অ্যাসাইলাম থেকে নিয়ে যাবার জন্য। সব ভেবে..."

আমার ঘুম পাচ্ছিল। একটু আগে আমাকে ডাক্তার ইঞ্জেকশান দিয়েছেন। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুনতে পেলাম ওয়ার্ডেন বলছেন, "আমি স্যার আপনাকে শুরুতেই বলেছিলাম। যে ছেলে এগারো বছর বয়েসে নিজের বোনকে গলা টিপে মারতে পারে..."

লেখকের জবানি : এই কাহিনিরও অর্ধেকের বেশি আমার নিজের কানে শোনা। আমার বাল্যবন্ধু অনির্বাণ চক্রবর্তী (যার ডাকনাম লাল্টু) দুই বছর আগে এক রাতে সস্ত্রীক যশোর রোড দিয়ে আসার সময় এক অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হয়। প্রায় হুবহু সেই অভিজ্ঞতাই এখানে লিখেছি, যদিও কথককে বদলে। শেষের হরোউইৎস সম ক্লাইম্যাক্স একেবারেই আমার প্ল্যান।

বারো মিনিট

আজ ২৬ জুন। দুপুর দুটো বারো। তিরিশ তলা অফিসের কার্নিশে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর অরবিন্দ মুস্তাফি। আর কয়েক সেকেন্ড পরেই তিনি ঝাঁপ দিয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করবেন। আর যে অনিবার্য ঘটনাবলির কারণে তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তার শুরু হয়েছিল ঠিক বারো মিনিট আগে।

দুপুর দুটো, ড. মুস্তাফির চেম্বার

খুব ধীরে চেম্বারের দরজা খুলে গেল। উঁকি দিল সেক্রেটারি লরার মুখ। অন্যদিন ওঁর গালভরা হাসি দেখলেই ড. মুস্তাফির দিন ভালো হয়ে যায়। আজ লরার সারা মুখ ছাইবরন। মুখে ভয়ের ছাপ। বোধহয় একটু আগে কেঁদেছে, চোখদুটো ফোলা ফোলা। এরকম কিছু একটা হতে পারে সেটা আগেই আন্দাজ করেছিলেন ড. মুস্তাফি। ভিতরের উত্তেজনা না দেখিয়ে শান্ত গলাতেই বললেন, "ভিতরে এসো।" লরা প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেই হাঁউমাউ করে উঠল।

"আপনি পালান, এক্ষুনি পালান ডক্টর। যেভাবে হোক আপনি পালান। ওঁরা আপনাকে খুন করবে। ভোট হয়েছিল, দুজন বাদে সবাই আপনার বিরুদ্ধেই ভোট দিয়েছে। মাধবন তো আপনাকে মারার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ও-ই সবাইকে আপনার বিরুদ্ধে উসকাচ্ছে।"

"ওহহ, সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং শেষ হল বুঝি..."

দুপুর দুটো চার, এ.সি.এ.-র মিটিং রুম

এ.সি.এ. অর্থাৎ এলিয়েন কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশনের ঝাঁ চকচকে মিটিং রুমে একটু আগেই বেশ গরম গরম মিটিং শেষ হয়েছে। সিদ্ধান্ত পাশ হতে ভোট করতেই হল, কারণ ডক্টর ক্রোল আর ডক্টর গুহ প্রথম থেকেই মুস্তাফির পক্ষে সওয়াল করে যাচ্ছিলেন। তবু কর্তব্য আগে। নিয়ম, অনুশাসন আগে। সেখানে ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টের কোনও মানে নেই। পৃথিবী আর সংস্থার জন্য যে ক্ষতিকর, তাকে চলে যেতেই হবে।

তিনি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হলেও।

এই নিয়মাবলি ড. মুস্তাফির নিজের খসড়া করা। ভাগ্যের পরিহাসে নিজের নিয়মের ফাঁদে তিনি নিজেই ধরা পড়েছেন। অন্য কেউ হলে এই মিটিং-এর দরকারই পড়ত না। সরাসরি হত্যার আদেশ দিত সেন্ট্রাল কমিটি। আগেও দিয়েছে। এতক্ষণে মুস্তাফির দেহ শোভা পেত মাটির গভীরে রাখা ক্রায়োচেম্বারে। কিন্তু হাজার হোক ড. মুস্তাফি প্রায় একা হাতে এই সংস্থা গড়ে তুলেছেন। ভিনগ্রহ থেকে পৃথিবী দখল করতে আসা প্রাণীদের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাই এই মিটিং।

"কী ভাবছেন ড. ক্রোল? চিন্তা করবেন না। ঠান্ডা ঘরে খুব আরামেই থাকবেন ড. মুস্তাফি", হাসি হাসি মুখে বললেন ড. মাধবন। মূলত তাঁর উদ্যোগেই মৃত্যুদণ্ডটা এত তাড়াতাড়ি হল।

"কিন্তু তাতে কি কোনও সুরাহা হবে মাধবন? বিশেষ করে মুস্তাফির মতো একজন ইউএফও এক্সপার্টকে হারালে..."

ক্রোলের কথা শেষ হতে দিলেন না মাধবন। হাত তুলে থামিয়ে বেশ রূঢ় গলাতেই বললেন, "সেটা আমিও অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেই ড. মুস্তাফি আর আজকের মুস্তাফিতে আকাশপাতাল ফারাক। কুড়িটা বছর পেরিয়ে গেছে মাঝখানে। চেহারায় বোঝা না গেলেও আসলে ওঁর ভীমরতি ধরেছে। ওঁর ভুলেই আজ আমাদের বাহান্ন জন এজেন্ট মারা গেছে। পৃথিবীর সুরক্ষা বিপন্ন। কী জবাব দেবেন তাদের পরিবারকে? সবচেয়ে বড়ো কথা, কিছুদিন বাদে আমরা আদৌ বাঁচব কি না সেটা নিয়ে ভেবেছেন?" উত্তেজনায় মাধবনের মুখ লাল হয়ে গেল।

"মুস্তাফিকে মরতেই হবে।"

দুপুর দুটো ছয়, ড. মুস্তাফির চেম্বার

মাথার দুপাশের দুটো রগ চেপে ধরে বসে আছেন ড. অরবিন্দ মুস্তাফি। এ.সি.এ.-র বর্তমান প্রধান। চোখের সামনে ফ্ল্যাশব্যাকের মতো ফুটে উঠছে গত কুড়ি বছরের নানা দৃশ্য। কে ভেবেছিল এক অনামী, অখ্যাত জায়গা থেকে উঠে আসা অরবিন্দ মুস্তাফি একদিন পৃথিবীর অন্যতম সেরা সংগঠনের প্রধান হবে! কুড়ি বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম সমস্যাটা শুরু হয়। পৃথিবীর আশেপাশের গ্রহ, বিশেষ করে মঙ্গলের পরিবেশ বদলাতে থাকে দ্রুত। খুব স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গলবাসীরা প্রতিবেশী গ্রহ পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ শুরু করে। গোপনে। একের পর এক ইউএফও নামতে থাকে পৃথিবীর জনমানবহীন প্রান্তরে। নেভাদায়, থরে, আন্টার্কটিকায়। সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিশ্বের নানা স্থানে। এর আগেও একবার এরা এসেছিল। সেবার দুটো ভুল করেছিল ওরা। এক, বড্ড তাড়াহুড়ো করে একবারে পৃথিবী দখলের চেষ্টা করেছিল, আর দুই, পৃথিবীর জীবাণুদের বিরুদ্ধে কোনওরকম সুরক্ষা নেবার কথা ভাবেনি।

কিন্তু এবার তাদের প্ল্যান অনেক বেশি স্থির, নির্ভুল। যাকে ইংরাজিতে অ্যাডাপ্টেশান বলে, সেই ক্ষমতা এদের অসীম। নতুন পরিবেশে মানুষের মতো চেহারা ধারণ বা ভাষা শিখতে মাত্র কয়েকদিন লাগত তাদের। তারপরেই পৃথিবীর মানুষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এরা বংশবিস্তারের চেষ্টা চালাত। ঠিক এখানেই প্রকৃতি তাদের সহায় হত না। এই সংকর প্রাণীরা দেখতে কদাকার, বিকৃত। চেহারা দেখেই তাদের আলাদা করা যায়। ক্রমাগত এদের সংক্রমণ থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর যিনি উদ্যোগ নেন, তিনি ড. মুস্তাফি। তিনিই প্রথম সরকারকে এসিএ স্থাপনের পরামর্শ দেন। সংকর প্রাণীদের দেখামাত্র হত্যার প্রস্তাবও তিনিই দিয়েছিলেন। এই সংস্থার সব নিয়ম তাঁর নিজের গড়া।

আজ তিনি জানেন কী পরিণতি অপেক্ষা করছে তাঁর সামনে। হয়তো পৃথিবীর সামনেও।

দুপুর দুটো আট, ড. মাধবনের চেম্বার

"আপনারা এত সেন্টিমেন্টাল কেন হচ্ছেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। মানলাম ইউএফও এক্সপার্ট, মানলাম সংস্থার প্রধান, কিন্তু আজ অবধি কাজের কাজটা তেমন কী করেছেন বলতে পারেন?" উত্তেজিত গলায় বলছিলেন মাধবন।

“সে তো আপনি বলবেনই”, গলায় শ্লেষ মিশিয়ে বললেন মুস্তাফির অ্যাসিস্ট্যান্ট ড. শিশির গুহ। “আপনার প্রেসিডেন্ট হবার পথের কাঁটা তো একজনই ছিলেন। মুস্তাফি। এ কথা কে না জানে!”

“একদম বাজে কথা বলবেন না। আর মুস্তাফি নিজে কটা মঙ্গলবাসীকে ধরেছেন বলুন তো? একটাও না। সবসময় আমরা খবর পেয়ে গেছি আর গিয়ে দেখেছি ভাঙা ইউএফও-র টুকরোটাকরা পড়ে আছে। আমি নিজের হাতে দুটোকে ধরেছিলাম একবার। মানুষের মতোই দেখতে, মনে আছে আপনার?”

“হ্যাঁ, আর এটাও মনে আছে ইনভেস্টিগেশনের নামে আপনি অত্যাচার করে তাদের মেরে ফেলেছিলেন। আপনার যে কোনও বিভাগীয় তদন্ত হয়নি, সেটা কিন্তু মুস্তাফি স্যারের জন্যেই।”

“আমি তখনও বলেছি, এখনও বলছি, ওরা কীভাবে মারা গেল আমি জানি না। আগের দিন রাত অবধি একেবারে ঠিক ছিল। পরদিন এসে দেখি মরে পড়ে আছে। গোটা দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই, কিচ্ছু নেই…”

“তারপরেও আপনি এই চেয়ারেই আছেন, ক্রায়োচেম্বারে ঢোকেননি, সেটা কার জন্য জানেন তো? ড. মুস্তাফির জন্য।”

“আর যে ক্ষতিটা করে গেলেন? সেটা তো বলছেন না… বহুদিন ধরে মঙ্গলবাসীরা চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে ওদের জিনের মিউটেশান ঘটানো যায়। তাহলে আর সংকর সন্তান বিকৃত হবে না। ওরা ইচ্ছেমতো চারিয়ে বসবে গোটা পৃথিবীতে। আর সেই কাজে ওরা প্রায় সফল। শুধু তাই না, আমাদের ইন্টেলিজেন্সের কাছে এটাও খবর ছিল যে ওরা এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যাতে মঙ্গল থেকে পৃথিবী যাতায়াত করতে আর ইউএফও লাগবে না। কী ভয়ানক হবে বুঝতে পারছেন? এখন তাও আমাদের রাডার ওদের গতিবিধি ধরতে পারে, তখন তাও পারবে না।”

“এই নতুন পদ্ধতিটা কী?”

“সেটাই তো কেউ জানে না। তদন্তের প্রায় শেষ দশায় চলে এসেছিলাম। শুধু আপনাদের মুস্তাফির একটা ভুলে…”

দুপুর দুটো দশ, ড. ক্রোলের চেম্বার

গম্ভীর মুখে এসিএ-র গোপন রিপোর্টটা ওলটাচ্ছিলেন ড. ক্রোল। মোটা লাল ফাইলে দুশো পাতার রিপোর্ট। শেষে লেখা, “এসিএ-র গোপন কমিটি বাহান্ন জন সবচেয়ে দক্ষ কর্মীদের নিয়ে একটা সার্চ কমিটি তৈরি করে। এর প্রধান ছিলেন ড. মাধবন। এঁদের কাজ ছিল যে ল্যাবরেটরিতে মঙ্গলবাসীরা গোপনে মিউটেশান চালাচ্ছে, সেটা খুঁজে বার করা, আর জানা কীভাবে ইউএফও ছাড়া ওরা পৃথিবীতে আসার কথা ভাবছে। এই দলের নেতা ছিল জেরেমি সন্ডার্স নামে বছর তিরিশের এক ছোকরা। সব ঠিকঠাক চলছিল, শেষ খবরে সন্ডার্স জানায় সে খবর পেয়েছে কোথায় চলছে এই এক্সপেরিমেন্ট। তবে কাউকে জানায়নি। মাধবনকেও না। একদিন দলের বাহান্ন জনকে নিয়ে অতর্কিতে হানা দিয়েছিল সেই ল্যাবে। খুব সম্ভব যোগাযোগ করতে গেছিল হেড কোয়ার্টারে। কিন্তু পারেনি। কারণ হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগের তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি সেদিনই বদলে দিয়েছিলেন ড. মুস্তাফি। সুরক্ষার জন্য এটা প্রায়ই করা হয়। কিন্তু করার আগে দেখে নিতে হয় কেউ

কোনও মিশনে আছে কি না। একটা সামিট মিটিং করতে হয়। মুস্তাফি এসব কিচ্ছু না করে আচমকা ফ্রিকোয়েন্সি বদলে দেন। ফলে সন্ডার্সের দল আর যোগাযোগ করতে পারেনি।

পরের দিন তাদের ছিন্নভিন্ন দেহগুলো পাওয়া যায় এসিএ-র সদর দপ্তরের সামনে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ড. মুস্তাফি জানিয়েছেন, নিয়ম থাকলেও এই সামান্য কারণে মিটিং ডাকার প্রয়োজন হবে তিনি ভাবেননি। এর আগেও তিনি এই কাজ করেছেন। এবার যে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে তা বুঝতে পারেননি। তিনি প্রধান হলেও মাধবন তাঁকে এই মিশনের ব্যাপারে অন্ধকারে রেখেছিলেন। আগে জানা থাকলে তিনি এই কাজ কখনোই করতেন না।

মাথা নাড়লেন ক্রোল। আর কিচ্ছু করার নেই। নিয়ম নিয়মই। মুস্তাফিকে মরতেই হবে।

দুপুর দুটো বারো, ড. মুস্তাফির চেম্বার

ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে ঘড়ির দিকে তাকালেন ড. মুস্তাফি। দুটো বারো। তিনি বুঝে গেছেন তাঁর জন্য ভবিষ্যৎ কী নিয়ে অপেক্ষায় আছে। নিজের হাতে গড়া এসিএ-র ক্রায়োচেম্বারে বরফের চাঁই হয়ে শুয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। এই অপমানের মৃত্যু তাঁর জন্য নয়। চিরটাকাল যা করেছেন, আজও তাই করবেন। নিজের ভাগ্য গড়ে নেবেন নিজের হাতে। পৃথিবী থেকে বিদায় তাঁর নিজের ইচ্ছেমতোই হবে। কোনও মাধবন সেটা ঠিক করে দেবে না।

শেষটা বড্ড অপমানের হল। এমনটা হবে কখনও ভাবেননি মুস্তাফি। কী আর করা! সবকিছু তো আর নিজের হাতে থাকে না! চেম্বার খুলে ল্যাবে ঢুকলেন তিনি। অন্ধকার ল্যাব। জানলা খুলে দিতেই এক ঝলক রোদ্দুর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিতরে। তিরিশ তলার ওপর থেকে গোটা শহরকে পিঁপড়ের মতো খুদে লাগছে। গুটিগুটি পায়ে জানলার কাছে দাঁড়ালেন মুস্তাফি। জোর হাওয়া বইছে। একটা চেয়ার নিয়ে কার্নিশে উঠে দাঁড়ালেন। আর কোনও ভয় নেই, কোনও খেদ নেই। অনেক হয়েছে। আর মায়া বাড়িয়ে কী লাভ? তিনি জানেন তাঁর মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। কার্নিশে দাঁড়িয়ে দুহাত পাখির মতো মেলে দিলেন তিনি। ঝাঁপ দিলেন। নিচে নামতে থাকলেন...

...আর তারপরেই সোঁ করে উড়ে চললেন তাঁর নিজের গ্রহ মঙ্গলের উদ্দেশে।

লেখকের জবানি : কল্পবিজ্ঞান নিয়ে লেখা খুব একটা হয়নি। এই গল্পের আইডিয়া মূলত একটা ছবি দেখে। উইল আইজনারের আঁকা সেই ছবিতে কোটপ্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক উড়ে উড়ে ভিনগ্রহে যাচ্ছেন। ভিনগ্রহী মানেই যে বিকট কিছু, সেই ধারণা দূর হয়েছিল সেদিনই। গল্প লেখার সময় সেটাই মাথায় ছিল আর কি...

শেষ মেষ

ঘরটা বেশ পরিষ্কার, ওম ওঠা, ভারী পর্দা টানা। দুটো টেবিল ল্যাম্পের একটা এধারে, অন্যটা ওধারে জ্বলছে। টেবিলের পাশে সাইডবোর্ডে দুটো লম্বাটে গেলাস। তাতে সোডা আর বরফকুচি ভরা।

মেরি মালোরি তাঁর স্বামীর বাড়িতে আসার অপেক্ষা করছেন। মাঝে মাঝেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলেন কটা বাজে। তবে উৎকণ্ঠায় নয়, উত্তেজনায়। তাঁর স্বামীর বাড়িতে পৌঁছাবার ক্ষণটি এগিয়ে আসছে যে! মিসেস মালোরির মুখে মৃদু হাসি। তাঁর আঙুলগুলো সেলাইতে ব্যস্ত। আর মাত্র তিন মাস— মা হতে চলেছেন মেরি। তাঁর নরম ঠোঁট, চোখের পাতা, গালের চকচকে ভাব, সবকিছুতেই যেন সেই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে।

পাঁচটা বাজতে দশ। রোজকার মতো আজও কাঁকুরে রাস্তায় গাড়ির টায়ারের আওয়াজ পেলেন মেরি। গাড়ির দরজা দড়াম করে বন্ধ হল। মৃদু পায়ের শব্দ আর দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন তিনি, যাঁর জন্য এত আয়োজন।

"হ্যালো ডার্লিং", মেরি বললেন।

"হ্যালো", উত্তর এল শুকনো গলায়।

মেরি তাঁর স্বামীর কোটটা খুলে নিয়ে আলমারিতে গুছিয়ে রাখেন। টেবিলের ধারের সেই লম্বাটে গেলাস দুটোতে ড্রিংকস বানালেন। একটা স্বামীর হাতে ধরিয়ে অন্যটা নিজে নিয়ে চেয়ারে দোল খেতে লাগলেন মেরি। আজ তাঁর স্বামীকে কেমন যেন অচেনা লাগছে। অন্যমনস্ক। গম্ভীরও।

"খুব ক্লান্ত লাগছে তোমার?"

"হ্যাঁ। আমি সত্যিই খুব ক্লান্ত", বলেই প্রায় এক চুমুকে গোটা পানীয়টা গলায় ঢেলে দিলেন তাঁর স্বামী। এমনটা তো ও কখনও করে না! মেরি শঙ্কিত হলেন।

"দাঁড়াও, তোমাকে আর একটা ড্রিংক বানিয়ে দিই", তাঁর সাধের চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন মেরি।

"তুমি বসো। আমি বানাচ্ছি।"

মেরি আড়চোখে খেয়াল করলেন এবার মদে সোডার পরিমাণ বড্ড কম। প্রায় নেই বললেই চলে। অদ্ভুত অস্বস্তিকর একটা মাপ।

"আমি তোমার চপ্পলটা নিয়ে আসি।"

"না।"

"এটা একদম ঠিক না। তোমার মতো একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে এরা নিত্যদিন দৌড় করিয়ে মারে..."

অন্যদিক থেকে কোনও উত্তর এল না। মেরি আবার মাথা নিচু করে সেলাই শুরু করলেন। গোটা ঘর নিস্তব্ধ। শুধু কাচের গায়ে বরফের টুকরো লেগে টুংটাং শব্দ হচ্ছে।

“ডার্লিং, আমি বরং তোমার জন্য একটু চিজ বানিয়ে আনি। আসলে আজ বিষ্যুদবার তো, ভেবেছিলাম বাইরে খেতে যাব… তাই…”

“দরকার নেই।”

“না, মানে তুমি যদি খুব ক্লান্ত থাকো তবে বাদ দাও। ফ্রিজে প্রচুর মাংস আছে, চিজ আছে, আমরা নাহয় আজ ঘরেই কিছু বানিয়ে খেয়ে নেব”, বলে ঘাড় কাত করে মুচকি হাসলেন মেরি।

অন্যদিক থেকে কোনও সাড়া এল না।

“যাই হোক, একটু চিজ আর চটপটিভাজা তো নিয়ে আসি।”

“দরকার নেই। বললাম তো।”

“তাহলে আজ রাতে খাবেটা কী?” একটু আমতা আমতা করেই মেরি বললেন, “ভেড়ার মাংসের চপ? নাকি পর্ক বানাব? যা বলবে। সব মজুত আছে ফ্রিজে।”

“কিচ্ছু লাগবে না। বাদ দাও।”

“কিন্তু কিছু তো একটা খাবে? আচ্ছা তুমি বলো, আমি রেঁধে দিচ্ছি”, বলেই উঠে দাঁড়ালেন মেরি।

“তুমি চুপ করে বসো। বসতে বলছি তো।” অদ্ভুত গলায় নির্দেশ এল।

এবার কেমন একটা অজানা ভয় মেরিকে চেপে ধরতে লাগল।

“যা বলছি তাই করো। বসো এই চেয়ারে”, তাঁর স্বামীর গলায় অদ্ভুত আদেশের সুর।

বাধ্য মেয়ের মতো চেয়ারে বসে অবাক চোখে তাঁর স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন মেরি। তাঁর স্বামী মদের গেলাসটা আবার এক চুমুকে শেষ করে ভুরু কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে।

“শোনো, তোমাকে একটা কথা বলব।”

“কী কথা?”

মুখের প্রতিটা পেশি শক্ত। দৃষ্টি নিচে। মেরি খেয়াল করে দেখলেন তাঁর স্বামীর বাঁ চোখটা যেন একটু কাঁপছে।

“হয়তো শুনে তুমি একটু আহত হবে, কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম সোজা কথাটা সোজাভাবে বলে ফেলাই ভালো। পষ্ট কথায় কষ্ট নেই।”

কথাটা বলতে বেশিক্ষণ লাগল না। চার মিনিট কি পাঁচ মিনিট বড়োজোর। মেরি পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে স্বামীর প্রতিটা কথা শুনছিলেন, কিন্তু একটা শব্দও তাঁর মাথায় ঢুকছিল না।

“তবে হ্যাঁ, তোমায় ছেড়ে দিলেও তোমার দায়িত্ব অস্বীকার করছি না আমি। মাসে মাসে কিছু মাসোহারা পাঠাব, তাতে তোমার দিব্যি চলে যাবে। তুমি আবার এ নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে অনর্থ বাধিয়ো না।”

মেরির গোটাটাই একটা বাজে রসিকতা বলে মনে হচ্ছিল। নিশ্চয়ই তিনি স্বপ্ন দেখছেন। এখুনি জেগে উঠবেন। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে “আমি এখুনি খাবার বানিয়ে আনছি” বলে রান্নাঘরে ছুটলেন মেরি। এবার আর তাঁর স্বামী তাঁকে বাধা দিলেন না।

রান্নাঘরে গিয়ে তাঁর মনে হল হাত পা যেন আর নিজের বশে নেই। মাথা ঘোরাচ্ছে। ভয়ানক বমি পাচ্ছে। তিনি কলের পুতুলের মতো স্যুইচ অন করলেন, বাতি জ্বালালেন, ডিপ ফ্রিজ খুললেন আর সেখান থেকে বার করে আনলেন ব্রাউন পেপারে মোড়া লম্বাটে একটা জিনিস— ঠান্ডায় জমে শক্ত হয়ে যাওয়া একটা ভেড়ার ঠ্যাং। ঠিক হ্যায়। আজ বরং ভেড়ার মাংসই রান্না হবে। তার আগে জলের ধারার নিচে রেখে এটাকে নরম করা দরকার। দুই হাতে গদার মতো সেই ঠ্যাংটা ধরে বসার ঘরে ঢুকলেন মেরি।

"হা ভগবান! তোমায় বললাম না, আজ রাতে আমি এখানে খাব না। বেরোব এখুনি।" মেরির পায়ের শব্দ শুনে পিছন ফিরেই গর্জে উঠলেন তাঁর স্বামী।

মেরি কোনও উত্তর দিলেন না। সোজা তাঁর স্বামীর পিছনে হেঁটে এসে একটুও না থেমে বিশাল সেই জমে যাওয়া ভেড়ার ঠ্যাংটা মাথার ওপরে তুলে সজোরে নামিয়ে আনলেন তাঁর স্বামীর খুলি বরাবর। লোহার ডান্ডা দিয়ে মারলেও আঘাত এতটা মারাত্মক হত না। খুব ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে পিছিয়ে এলেন মেরি। মজার ব্যাপার, আঘাতের পরও চার পাঁচ সেকেন্ড দেহটা তেমনই খাড়া রইল। অল্প দুলল। তারপর সটান কার্পেটে লুটিয়ে পড়ল। নাকের সামনে হাত দিয়ে মেরি দেখলেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

"যাক", বিড়বিড় করে মেরি বললেন, "তাহলে আমি ওঁকে খুন করেই ফেললাম।"

এবার খুব দ্রুত ভাবতে থাকলেন মেরি। পুলিশের বউ তিনি। এই খুনের শাস্তি যে কী, তা তাঁর থেকে ভালো কেউ জানে না। তাও তিনি মেনে নিতেন। কিন্তু যে সন্তান এখনও পৃথিবীর আলো দেখেনি তার জন্য তাঁকে বাঁচতে হবে। ঠান্ডা মাথায় ভেড়ার ঠ্যাংটা রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন মেরি। জলে ধুয়ে, পাত্রে রেখে, সোজা পুরে দিলেন আভেনে। আভেনের নবটা উসকে দিতে ভুললেন না। হাত ধুয়ে সিঁড়ি বেয়ে বেডরুম। সেখানে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যত্ন করে গালে পাউডার বোলালেন। ঠোঁটে লাগালেন রক্তলাল লিপস্টিক। হাসবার চেষ্টা করলেন। অদ্ভুত লাগল। আবার চেষ্টা করলেন।

"হ্যালো স্যার", জোর গলায় বলতে গিয়ে নিজের কানেই বেসুরো ঠেকল। আবার চেষ্টা করলেন।

"আমাকে কিছু আলু দেবেন তো স্যাম। আর হ্যাঁ, এক প্যাকেট মটরশুঁটি।"

এতক্ষণে ঠিকঠাক হয়েছে। হাসি আর গলার আওয়াজ। দুটোই একেবারে স্বাভাবিক। আরও বেশ কয়েকবার বলা মকশো করে নিলেন মেরি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে, ওভারকোট চাপিয়ে, পিছনের দরজা, বাগান পেরিয়ে সোজা বড়ো রাস্তায়।

তখনও ছটা বাজেনি। কিন্তু দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে।

"হ্যালো স্যার", একগাল হেসে বললেন তিনি।

"আরে মিসেস মালোরি যে! কেমন আছেন বলুন।"

"আমাকে কিছু আলু দেবেন তো স্যাম। আর হ্যাঁ, এক প্যাকেট মটরশুঁটি।"

স্যাম পিছন ফিরে আলু আর মটরশুঁটি গোছাতে লাগল।

"আর বলেন কেন, প্যাট্রিক আজ অফিস থেকে ফিরে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বলছে বাইরে খেতে যাবে না। আমরা তো প্রতি বিযুদবার বাইরে খেতে যাই। রাঁধতে গিয়ে দেখি ঘরে সব সবজি বাড়ন্ত।"

"মাংস লাগবে মিসেস মালোনি?"

"না না, ফ্রিজে মস্ত বড়ো একটা ভেড়ার ঠ্যাং আছে।"

"ওহহ।"

"আসলে ঠান্ডা মাংস আবার আমার তেমন পোষায় না, কিন্তু এখন আর উপায় কী? ওটাই রাঁধব। ঠিক আছে না?"

"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। এই নিন বড়ো বড়ো চন্দ্রমুখী আলু দিয়েছি। মাংস হল, সবজি হল, আর শেষপাতের ডেজার্ট বাকি থাকে কেন? ডেজার্টে কী করছেন?"

"আপনিই বলুন।"

"একটা বড়ো দেখে চিজকেক নিয়ে যান। আপনার স্বামীর পছন্দই হবে।"

"জব্বর আইডিয়া। চিজকেক প্যাট্রিকের দারুণ পছন্দ।"

সব প্যাক হয়ে গেলে একমুখ হাসি ছড়িয়ে মেরি বললেন, "অনেক ধন্যবাদ স্যাম। গুড নাইট।"

এবার একটু পা চালিয়ে বাড়ি ফিরলেন মিসেস মালোনি।

হাজার হোক, তাঁর স্বামী সারাদিন খাটাখাটনির পর বাড়ি ফিরেছেন। তাঁকে তো রান্না করে খাওয়াতে হবে, নাকি! কিন্তু দরজা খুলেই যে দৃশ্য তিনি দেখবেন তা এতটাই অপ্রত্যাশিত যে ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তবে তিনি তো কিছু দেখবেন বলে ভাবছেন না। তিনি শুধু তাঁর ক্ষুধার্ত স্বামীর জন্য সবজি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর চলনবলনও সেইরকমই হওয়া উচিত। নিজেকেই নিজে বলতে বলতে চললেন মেরি। পিছনের দরজা দিয়ে গুনগুন করে গাইতে গাইতে ঢুকেই হাঁক পাড়লেন, "প্যাট্রিক! তুমি কী করছ সোনা?" হাতের প্যাকেটটা টেবিলে রেখে এবার তিনি বসার ঘরে ঢুকলেন। সেখানে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন তাঁর স্বামী। এতকালের ভালোবাসা। তিনি দৌড়ে গেলেন সেই দেহের কাছে। কেঁদে উঠলেন বুকফাটা আর্তনাদে। তারপর কোনওক্রমে ফোনের কাছে গিয়ে পুলিশ স্টেশনে ডায়াল করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "শিগগির! দয়া করে শিগগির আসুন। প্যাট্রিক মারা গেছে!"

"কে বলছেন?"

"মিসেস মালোনি, প্যাট্রিক মালোনির স্ত্রী।"

"বলেন কী! প্যাট্রিক মারা গেছে!"

"আজ্ঞে তাই তো মনে হচ্ছে", ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন মেরি, "মেঝের ওপর পড়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে দেহে প্রাণ নেই।"

"এখুনি আসছি আমরা।"

খানিকক্ষণের মধ্যেই গারি এসে হাহির। গাড়ি থেকে যে দুজন নেমে এলেন তাঁরা দুজনেই মেরির পূর্বপরিচিত। এঁরা প্যাট্রিকের সহকর্মী। মেরি ছুটে গিয়ে জ্যাক নুনানকে জাপটে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন। জ্যাক তাঁকে খুব যত্ন করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। অন্যজন, ওম্যালি, তখন মৃতদেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

"ও কি সত্যিই মারা গেছে?" ডুকরে উঠলেন মেরি।

"তাই তো মনে হচ্ছে। কী হয়েছিল বলুন তো?"

খুব সংক্ষেপে মেরি তাঁর বিবৃতি দিলেন। কীভাবে সামান্য সময়ের জন্যে সবজি কিনে ফিরে এসেই তিনি এই দৃশ্য দেখলেন। এই ফাঁকে নুনান মৃতদেহের খুলিতে চাপ বাঁধা একদলা রক্ত দেখতে পেয়ে ওম্যালিকেও দেখালেন। এরপর একে একে নানাধরনের মানুষ আসতে শুরু করল। এক ডাক্তার, দুই গোয়েন্দা (যাদের একজনকে আবার মেরি আগে থেকে চেনেন), ফটোগ্রাফার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, সবাই মৃতদেহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছিল। গোয়েন্দারা মেরিকে প্রচুর প্রশ্ন করলেও তাতে নম্রতার কমতি ছিল না। মেরি বললেন একদম শুরু থেকে। যখন উনি সেলাই করছিলেন। প্যাট্রিক এলেন। ক্লান্ত প্যাট্রিক বাইরে খেতে যেতে না চাওয়ায় মেরি ঘরেই রান্না করবেন বলে ঠিক করেন। সবজি না থাকায় তাঁকে দোকানে যেতে হয়।

“কোন দোকান?”

মেরির উত্তর শুনে গোয়েন্দা তাঁর সহকারীকে ফিসফিস করে কিছু বলতেই সে একছুটে বেরিয়ে গেল। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে যখন ফিরল তখন তার হাতের কয়েক তাড়া কাগজে কীসব যেন নোট নেওয়া। মেরি তাঁর অবিশ্রান্ত ফোঁপানির মধ্যেও শুনতে পেলেন চাপা গলার আওয়াজ, “হ্যাঁ... একেবারে স্বাভাবিক ব্যবহার... বেশ খুশি খুশিই ছিলেন... রান্না করবেন বলছিলেন... মটরশুঁটি... চিজকেক... না, না, ওঁর পক্ষে অসম্ভব...”

ডাক্তার চলে গেলে দুজন এসে প্যাট্রিকের লাশটা স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল। সবাই চলে গেলেও দুই পুলিশ আর গোয়েন্দা গেলেন না। নুনান অবশ্য বললেন দরকার হলে মেরি এই কদিন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে পারেন। মেরি রাজি হলেন না।

“আপনি বরং একটু বিশ্রাম নিন”, বলে তাঁরা গোটা বাড়ি তল্লাসি আরম্ভ করলেন। মাঝে নুনান এসে খবর দিলেন মেরির স্বামীর মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, আর সেই আঘাতেই প্যাট্রিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা সেই মার্ডার ওয়েপনটা খুঁজছেন। তাঁদের বিশ্বাস আততায়ী সেটা নিয়ে পালিয়েছে অথবা আশেপাশেই কোথাও ফেলে রেখে গেছে।

“সেই পুরোনো গল্প, বুঝলেন মিসেস মালোরি, মার্ডার ওয়েপনটা যদি একবার হাতে পাই, তবে খুন কে করেছে সেটা ধরা কোনও ব্যাপারই না।”

পরে গোয়েন্দা দুজন তাঁকে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন বাড়িতে কোনও ভারী লোহার স্প্যানার বা ফুলদানি আছে কি না। মেরি জানালেন ফুলদানি নেই, তবে গ্যারাজে স্প্যানার থাকতেও পারে। অতএব খোঁজ চলল। মাঝে মাঝেই কাঁকুরে পথে বুটের আওয়াজ। জানলার কাচে টর্চের আলো। মেরি বুঝলেন তদন্ত চলছে জোরকদমে।

রাত নটা। তখন সবাই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সার্জেন্ট নুনান রান্নাঘরে ঢুকেই চিৎকার করে বললেন, “আরে মিসেস মালোনি, আপনার আভেন তো অন করা, আর ভিতরে মাংসও দেখতে পাচ্ছি!”

“ওঃ কী অবস্থা! আমি ভুলেই গেছিলাম ওটার কথা!”

“আভেন বন্ধ করে দেব?”

“অনেক ধন্যবাদ জ্যাক। তবে আমার একটা উপকার করবেন?”

“বলুন। যদি সম্ভব হয়...”

“আপনারা সবাই প্যাট্রিকের প্রিয় বন্ধু। আপনারাই খুঁজে বার করবেন কে আমার প্যাট্রিককে এভাবে খুন করল। কিন্তু এখন নটা বেজে গেছে। আপনাদের খিদেও পেয়েছে

নিশ্চয়ই। আপনাদের না খাইয়ে রাখলে ওর আত্মা শান্তি পাবে না। ভেড়ার মাংসটা সদ্য রাঁধা। আপনারা কজন মিলে ওটা খেয়ে নিন না কেন!"

"না না, ছি ছি, এমন অবস্থায় খাওয়া..."

"প্লিজ জ্যাক। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। আমি নিজে আজ কিছুই খেতে পারব না। কিন্তু আপনারা না খেয়ে থাকলে আমি দুঃখ পাব। একটু খেয়ে নিয়ে আবার কাজ শুরু করুন। এটুকু অনুরোধ রাখুন আমার।"

খানিক আমতা আমতা আমতা করে চারজনই রাজি হলেন। হাজার হোক, খিদেও পেয়েছে জব্বর। রান্নাঘরে বসে ওঁরা খাচ্ছিলেন আর আলোচনা করছিলেন। খোলা দরজা দিয়ে তাঁদের গলা মিসেস মালোরির কানে আসছিল।

"আর একটু নাও চার্লি।"

"এই, একেবারে শেষ করে ফেলো না।"

"উনি শেষ করতেই বলেছেন। তাতেই নাকি উনি খুশি হবেন।"

"দাও তবে আর-একটু।"

"কী দিয়ে যে প্যাট্রিককে মারল সেটাই মাথায় আসছে না। খুলিটা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গেছে।"

"খুঁজে পাওয়া খুব একটা কঠিন হবে না। এ জিনিস তো আর কেউ হাতে নিয়ে ঘুরবে না", বলে ঢেঁকুর তুলল একজন।

"আমার মনে হয় এই বাড়িতেই কোথাও সেই মার্ডার ওয়েপনটা আছে। হয়তো আমাদের নাকের ঠিক তলাতেই। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কী বলো জ্যাক?" মাংসের হাড়ে কামড় বসিয়ে বলল একজন।

অন্য ঘরে মিসেস মালোনি নিজের অজান্তেই অদ্ভুত খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন।

অনুবাদকের জবানি : রোয়াল ডাল-কে বিশ্বের সেরা গল্পকথক বলে মনে করেন অনেকে। কিশোরদের জন্য মাতিল্ডা, চার্লি অ্যান্ড দি চকোলেট ফ্যাক্টরি সহ দারুণ দারুণ সব বই লিখেছেন। তবে বড়োদের গল্পের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় Lamb to the Slaughter। হিচকক নিজে এই কাহিনির টেলি চিত্রায়ন করেছিলেন। তাই এই কাহিনি অনুবাদের লোভ সামলানো মুশকিল।

সে এক অদ্ভুত পার্টি

"চল না", ভিক বলল, "দারুণ মজা হবে!"

"না হবে না", আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম; যদিও জানতাম আমার আপত্তি বেশিক্ষণ ধোপে টিকবে না।

"আরে সিরিয়াসলি বলছি, চ। অসাধারণ হবে", ভিক ঘ্যানঘ্যান করে এক কথা প্রায় একশোবার বলে চলল, "কত সুন্দরী মেয়ে আসবে জানিস?" বলতে বলতে তার সাদা সাদা দাঁতগুলো যেন মুখের বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

আমরা দুজনেই লন্ডনের দক্ষিণে একটা বয়েজ স্কুলে পড়ি। ভিকের নানা সময় দু-একটা বান্ধবী থাকলেও আমার ভাগ্যে ঢুঁ ঢুঁ। মূলত ছেলেদের সঙ্গেই আমরা মিশি। ভিকের এক বন্ধু তাকে একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন করেছে। সে যাবেই, আর আমি যেতে নারাজ। মুশকিল হল এই সপ্তাহে আমার মা বাবা কী একটা কনফারেন্সে বিদেশে গেছেন, আর গোটা হপ্তা আমি ভিকের বাড়ির অতিথি। না চাইলেও আমাকে ভিকের পিছু নিতে হয়েছে। কথা বলতে বলতে আমরা ইস্ট ক্রাইডন স্ট্রিটের একটা সরু গলি বেয়ে হাঁটছিলাম।

"এবারেও সেই গতবারের মতো হবে দেখিস। তুই দারুণ সুন্দরী একটা মেয়ে পটিয়ে তার সঙ্গে গপ্পে মজে যাবি, আর আমি রান্নাঘরে বসে তার মায়ের রাজনীতি কিংবা কবিতা নিয়ে বকরবকর শুনব", আমি গজগজ করে বললাম।

"আরে! তোকে তো আগে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, নাকি? ওসব আমি তোকে শিখিয়ে দেব। মনে হয় এই রাস্তাটাই হবে", ব্যাগ দোলাতে দোলাতে বলল ভিক।

"সে কী! তুই বাড়ি চিনিস না?"

"অ্যালিসন একটা কাগজে রাস্তার নির্দেশ লিখে দিয়েছিল। সে কাগজ আমি ভুলে হলের টেবিলে ফেলে এসেছি। কোই বাত নেহি। বাড়ি আমি ঠিক খুঁজে নেব।"

"কী করে?"

"কিচ্ছু না। এই রাস্তা ধরে সো-ও-জা এগিয়ে যাব আর দেখব কোন বাড়িতে পার্টি হচ্ছে। ব্যস।"

গোটা রাস্তাটা শুনশান। একটা বাড়ি দেখেও মনে হচ্ছে না যে সেই বাড়িতে পার্টি হচ্ছে। চারিদিকে সরু সরু সব বাড়ি। সামনে জং ধরা গাড়ি, বাইক আর আবর্জনাভরা বাগানের টুকরো। রাস্তা জুড়ে অদ্ভুত একটা গন্ধ। অজানা কোনও মশলার গন্ধের মতো। সেই রাস্তার শেষে আরও সরু, স্যাঁতসেঁতে একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম আমরা। তেড়াসোয়ালা বাড়ি সব। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। সব কেমন অদ্ভুতভাবে চুপচাপ। নিস্তব্ধ।

"তোর তো মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার দরকারই নেই। তুই একবার হেসে তাকালেই কাজ হয়ে যায়। সবই তোর ব্যক্তিত্বের কামাল", আমি বলেই ফেললাম।

"ধুসস, ওভাবে হয় নাকি? তোকে সাহস করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বুঝলি বুদ্ধুরাম!"

আমি জ্ঞানত কোনও দিন কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলিনি। জানি না কেমন করে বলতে হয়। সেটা এবার ভিককে বলেই ফেললাম।

"সত্যি! তুই এমন করছিস, যেন মেয়েরা কোনও অন্য গ্রহের জীব।"

রাস্তাটা ততক্ষণে একটা বাঁক নিয়েছে। আমিও বুঝে গেছি আমরা ভুল পথে এসেছি। এখানে কোথাও কোনও পার্টি হচ্ছে না। হঠাৎ খুব দূর থেকে বিকেলের সেই অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ভেঙে আমাদের কানে একটা চাপা বাজনার আওয়াজ এল। যেন বন্ধ দরজা জানলায় সেই আওয়াজ কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। সেই শব্দের দিকেই হেঁটে গেলাম দুজনে। মোরাম বিছানো বিষণ্ণ রাস্তা, এলোমেলো কিছু গোলাপের ঝাড় আর ছোট্ট একটা অগোছালো বাগান পেরিয়ে দরজার সামনে এসে ভিক ডোরবেল টিপল। দরজা খুলল একটা মেয়ে। তার বয়স কত বলা মুশকিল। আসলে পাঁচ, সাত এমনকি দশ বছর অবধি ছেলে আর মেয়েরা প্রায় একভাবে বেড়ে ওঠে, তারপরই কেমন দুম করে মেয়েরা বড়ো হয়ে যায়। তবে দেখে মনে হল মেয়েটা আমাদেরই বয়সি।

"হ্যালো", বলল মেয়েটা।

ভিক তড়বড় করে বলে চলল, "আমরা দুজন অ্যালিসনের বন্ধু। ওই যে কমলা রঙের চুল, হাসি হাসি মুখ, হামবুর্গে বাড়ি... ওর।"

"ও তো এখানে নেই। নাহহ", দরজায় দাঁড়িয়েই মেয়েটা জবাব দিল।

"সে কোনও ব্যাপার না। আমি হলুম ভিক আর এই হল আমার বন্ধু এন", বলেই ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া উপহারটা বার করে ভিক বলল, "এটা তবে কোথায় রাখব?"

এবার মেয়েটা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল।

"ওই টেবিলে রেখে দাও।"

মেয়েটার চুল সোনালি, ঢেউখেলানো। সত্যি বলতে কী, এত সুন্দর মেয়ে আমি জন্মে দেখিনি। নাম বলল স্টেলা। শুনেই ভিক একগাল হেসে জানাল এত সুন্দর নাম সে আগে শোনেনি। ব্যাটা শয়তান! সব্বাইকে এই এক কথা বলে। মেয়েটা আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা মিউজিক সিস্টেমে জোরে জোরে গান বাজছে। কয়েকটা মেয়ে আগে থেকেই নাচছিল। তখন পার্টির গান মানেই আমরা বুঝতাম স্ট্র্যাংলার, এলো ব্যান্ড কিংবা নিল ইয়ং-এর হারভেস্ট। কিন্তু এই ঘরে যে গান বাজছিল তা আমার চেনা কোনও গানের মতো না। এই অদ্ভুত ধাতব সুর পৃথিবীর কোনও যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারে বলে আমার জানা নেই। গোটা ছয়েক আমাদের বয়সি মেয়ে ধীর লয়ে সেই সুরেই নাচছিল। সঙ্গে স্টেলাও।

ভিক যথারীতি স্টেলার সঙ্গে আলাপ জমাল। ওরা কী বলছে, তা এই আওয়াজে শুনতে পাচ্ছিলাম না। বিরক্ত হয়ে কিচেনের দিকে পা বাড়ালাম। কিচেন টেবিলে বেশ বড়ো বোতলে কোকোকোলা রাখা। একটা প্লাস্টিকের কাপে তারই কিছুটা ঢেলে আমি মেয়ে দুটোকে খেয়াল করলাম। মাটিতে থেবড়ে বসে তারা গুজগুজ করে গল্প করছে। গায়ের রং কুচকুচে কালো। তাতে আলো পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে এমন চকচকে। পোশাক সিনেমা আর্টিস্টদের মতো। মাথা নেড়ে নেড়ে অদ্ভুত বিজাতীয় এক ভাষায় তারা গল্প চালিয়ে যাচ্ছে।

হাতে কোকের গেলাসটা নিয়ে ভিতর বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। বাইরে থেকে বোঝা যায় না ভিতরটা এত বড়ো আর এতগুলো ঘর। কিন্তু সব ঘরেই কেমন আবছা আবছা

অন্ধকার, যেন চল্লিশ ওয়াটের নিভু নিভু বালব জ্বালা। সবকটা ঘরেই দু-তিনজন করে মেয়ে বসে আছে। সবাই বিদেশি বলেই মনে হল। এমন মেয়েদের আমি আগে দেখিনি। এক কোণে কাচের গোল টেবিলে ধবধবে সাদা চুলের একটা মেয়ে উদাস চোখে বাইরের সন্ধে নামা দেখছিল। তার চুল কোমর ছুঁয়েছে।

"আমি একটু তোমার পাশে বসতে পারি?" সাহসে ভর করে বলেই ফেললাম।

মেয়েটা উত্তর দিল না। শুধু বিষণ্ণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। আমি ওর পাশের চেয়ারে বসলাম। তাকিয়ে দেখি ভিক আর স্টেলা হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে। আমি দোতলায় উঠিনি। জানি না ওখানে কী আছে। ভিক আমার দিকে চেয়ে একবার শুধু ঠোঁট নেড়ে বলল, "কথা বল।"

"তুমি কি এখানেই থাকো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আবার মেয়েটা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"আমি এন। তোমার নাম কী?"

"আমি ওয়েইনের ওয়েন। আমি দ্বিতীয়।"

"ওহহ... বাঃ, বেশ অন্যরকম নাম তো তোমার", এ ছাড়া আর কী বলব বুঝলাম না।

মেয়েটা তার ছলছলে চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এর মানে আমার স্রষ্টার নাম ওয়েইন। আমাকে ফিরে গিয়ে ওঁর কাছেই রিপোর্ট করতে হবে। আমি এই পৃথিবীতে বংশবিস্তার করতে পারব না।"

"মানে?"

মেয়েটা নিজের আঙুলগুলো টেবিলের ওপরে ছড়িয়ে দিল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা অদ্ভুত। ডগাটা সমান দুই ভাগে বিভক্ত। গাছের ডালের মতো।

"আমাকে যখন তৈরি করেছিল, তখন থেকেই এই গণ্ডগোলটা রয়ে গেছে। প্রথমে ভেবেছিল আমায় ধ্বংস করে দেবে। ভাগ্য ভালো করেনি। কিন্তু এখন আমায় ফিরে যেতে হবে। আমার জায়গায় আমার নিখুঁত বোনেরা আসবে। বংশবিস্তার করবে। ওরা প্রথম। আমি দ্বিতীয়। আমাকে শিগগির ওয়েইনে ফিরে গিয়ে জানাতে হবে তোমাদের এখানে আমি কী কী দেখলাম।"

"আমিও আসলে এখানকার না। আমিও ক্রাইডনে থাকি না।" আমি বোকার মতো বললাম। মেয়েটা কি তবে আমেরিকান? আমি ওর কথার কোনও মানেই বুঝতে পারছিলাম না।

"হ্যাঁ, সে তো বটেই", মেয়েটা বলে চলল এক নিঃসঙ্গ স্বরে, "আমরা কেউই তো এখানকার না, তাই না? আমি আসার আগে ভেবেছিলাম এই জায়গা কত বড়োই না হবে। যাক, তবু জায়গাটা দারুণ", বলতে বলতে সে চট করে নিজের বাঁ হাতটা ডান হাতের তলায় লুকিয়ে ফেলল। তারপর অগোছালো একটা হাই তুলে বলল, "ঘুরতে ঘুরতে আমি ক্লান্ত। সেদিন ব্রাজিলে রিওর কার্নিভালে ওদের দেখলাম। সোনালি রং। লম্বা। আর চোখ দুটো পোকাদের মতো। আমি তো দেখেই ছুটে হ্যালো বলতে গেছি। গিয়ে দেখি ওমা! এ তো কতগুলো মানুষ কস্টিউম পরে সেজেছে। আমি হোলা কোল্টকে বললুম, 'হ্যাঁ রে ওরা আমাদের মতো সেজেছে কেন?' হোলা বললে, ওরা নাকি আসলে নিজেরাই নিজেদের চেহারা পছন্দ করে না। সবার রং হয় গোলাপি, নয় বাদামি। আর কী

বেঁটে। ম্যাগো! কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। এই যে আমি, এখনও পুরো বাড়িনি, আমারই ওদের কেমন বামনবীর বলে মনে হয়, তো হোলার কী দোষ?"

তারপর এই প্রথম একগাল হেসে মেয়েটা বলল, "ভাগ্যিস মানুষগুলো হোলার আসল রূপ দেখেনি!"

"হুমম, তুমি নাচবে আমার সঙ্গে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে মেয়েটা আপত্তি জানাল। "নিয়ম নেই। আমি ওয়েইনের সম্পত্তি। আমি এমন কিছু করতে পারব না যাতে সেই সম্পত্তির ক্ষতি হয়।"

"তোমায় কিছু এনে দেব?"

"শুধু জল।"

আমি কিচেন থেকে নিজের জন্য কোক আর মেয়েটার জন্য জল এনে দেখলাম চেয়ার ফাঁকা। বেশ অবাক হয়ে সামনের ঘরে উঁকি মারলাম। দেখলাম প্রচুর মেয়ে আর কিছু ছেলেও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ভিকও নাচছে, স্টেলার সঙ্গে। খুব সম্ভব মেয়েটা দোতলায় গেছে, কারণ নিচে কোথাও ওকে দেখতে পেলাম না। হেঁটে লিভিং রুমের সোফায় বসলাম। একটা মেয়ে আগে থেকেই সোফার অন্য কোণে বসে ছিল। ছোটো ছোটো কালো চুল। স্পাইক করা। ভিকের উপদেশ মনে পড়ল। কথা বলতে হবে।

"উমম, এই মগের জলটা তুমি নিতে পারো, লাগবে?" খুব সন্তর্পণে, যেন কোনও দিনও কেউ তাকে কিছু দেয়নি, এমনভাবে আলগোছে মেয়েটা জলের মগটা ধরল। তারপর অল্প হেসে বলল, "আমার ঘুরতে খুব ভালো লাগে।" যেন দামি কোনও শরবত খাচ্ছে এভাবে জলের মগে হালকা চুমুক দিতে দিতে জানাল, "শেষবার সূর্যে গেছিলাম। সেখানের তাপপ্রবাহের সমুদ্রে তিমিদের সঙ্গে খেলেছি আমি। আসলে মহাশূন্যে ঠান্ডায় প্রায় জমে গেছিলাম। ভাগ্যিস সূর্যটা বেশ উষ্ণ! আমি চলে যাব ভাবছিলাম। কিন্তু কত কিছু দেখাই বাকি বলো! তার বদলে এখানে চলে এলাম। তোমার এই জায়গাটা ভালো লাগে?"

"মানে?"

কোচের একপাশে হেলান দিয়ে সে বলল, "আমার ওই একরকম লাগে। অনেকবার মা বাবাকে বলেছি পৃথিবীতে আসব না। শুনল না। এখানে নাকি অনেক কিছু শেখার আছে। সে তো সূর্যতেও শেখা যায়। জেসা তো আজ এই গ্যালাক্সি কাল ওই গ্যালাক্সিতে ঘুরে বেড়ায়। আমিও তেমন করতে চাই। আমার এই জায়গাটা একদম ভালো লাগে না। আমাকে নিয়ে একটা ক্যালসিয়ামের ফ্রেমে বাঁধানো গদগদে মাংসপিণ্ডের মধ্যে পুরে দিয়েছে। অসহ্য! শুধু মনে হয় কবে মুক্তি পাব। সবচেয়ে বড়ো কথা মুখ দিয়ে হাওয়া নিয়ে স্বরযন্ত্র নাড়িয়ে নাড়িয়ে কথা বলাটাও কী বিরক্তিকর! আমি বলে দিয়েছি, একদিন আমি নিশ্চিত মারা যাব। এই জগৎ থেকে মুক্তি পাবার নাকি সেটাই একমাত্র উপায়।"

আমি ধীরে ধীরে ওর দিকে এগোলাম। ওর চোখে জলের বিন্দু চকচক করছে, "আচ্ছা, এই যে তরল পদার্থটা চোখে এলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, কেন বলো তো? কেউ আমায় আজ অবধি বলেনি। আমি আজও বুঝে উঠতে পারি না!"

মেয়েটা আমার কাঁধে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ দেখি দরজার সামনে ভিক আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাশেই স্টেলা। আমি যেতেই ভিক লজ্জিতভাবে বলল, "এই শোন না, আমরা ভুল পার্টিতে চলে এসেছি।

এইমাত্র স্টেলার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম।"

"সে কী? আমাদের তাহলে চলে যেতে হবে?"

"সেরকম কিছু না। আসলে এরা সব ট্যুরিস্ট। ফরেন এক্সচেঞ্জে যেমন হয়, তেমনই। অনেকে জার্মানি থেকে আসে, যেমন অ্যালিসন এসেছে। তুই কথা বলছিস তো সবার সঙ্গে? আমি আর স্টেলা একটিবার দোতলা থেকে ঘুরে আসি, কেমন?"

স্টেলাকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল। গোটা পার্টিতে সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু যথারীতি ভিকের মিষ্টি কথায় মজে ও আমায় পাত্তাও দিচ্ছে না। ঘরে কেউ গল্প করছে, কেউ মজাদার চুটকি বলে সবাইকে হাসাচ্ছে, কিন্তু অনেক খুঁজেও আমি সেই কালো স্পাইক চুলের মেয়েটাকে দেখতে পেলাম না। হয়তো দোতলায় গেছে। ঘুরতে ঘুরতে আবার কিচেনেই ঢুকলাম। প্রচুর খাবার আর পানীয় রাখা। আমি একটা প্লাস্টিকের কাপে কোক আর বরফ নিলাম।

"কী খাচ্ছ তুমি?" একটা মেয়েলি গলা ভেসে এল।

"বরফ দিয়ে কোক।"

"আমায় দেবে?"

আমি একটা গ্লাসে ঢেলে দিতে গিয়ে মেয়েটার মাথাজোড়া ঝাঁকড়া টকটকে তামাটে চুল দেখে বেশ অবাক হলাম। চুলগুলো সব আংটির মতো প্যাঁচালো।

"কী নাম তোমার?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"ট্রায়োলেট।"

"সুন্দর নাম", বলেই আমার ভিকের কথা মনে পড়ল।

"আসলে এটা একটা কবিতা। আমার মতো।"

"তুমি একটা কবিতা?"

মেয়েটা হাসল। তার টিকালো নাক গ্রিক অ্যান্টিগোনের কথা মনে পড়ায়, কিংবা ব্যারি স্মিথের আঁকা কোনান কমিকসের মহিলাদের কথা।

"হ্যাঁ, কখনও আমি কবিতা, কিংবা একটা প্যাটার্ন, অথবা একটা জাতিও বলতে পারো।"

"তা কী করে হয়? একজন মানুষ একসঙ্গে তিনটে জিনিস হবে কীভাবে?"

"আচ্ছা তুমি বলো তোমার নাম কী?"

"এন।"

"দ্যাখো এন, তুমি একজন মানুষ। একজন পুরুষ। আবার একজন দ্বিপদ।"

"সে তো একটা জিনিসকেই তিনভাবে বলা, আলাদা কিছু না।"

মেয়েটা তার ডাগর দুটো চোখ বড়ো করে তাকাল। চোখের রং হালকা সবুজ। যেন কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেছে। ফিসফিস করে বলল, "সব বিভেদ দূর করে দেব আমরা। সবকিছু মিলেমিশে একটা কবিতা হয়ে যাবে। এই মহাবিশ্ব। এই পৃথিবী। আমরা যেখান থেকে এসেছি, যেখানে চলেছি, আমাদের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা এক কাব্যের রূপ নেবে।

তারপর দূরতর নক্ষত্রে আমরা সেই কাব্যের তরঙ্গকে পাঠাব। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে সে কবিতা ভাঙবে, জুড়বে, আবার নতুন এক কবিতার রূপ নেবে।"

"আর তারপর?"

"তারপর তুমি বদলে যাবে। যেভাবে প্রতিটা কবিতাপাঠ তোমায় একটু একটু করে বদলে দেয়। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ এক নিরবচ্ছিন্ন কবিতা হয়ে যাবে, যার অংশ তুমি, আমি, আমরা সবাই।"

একটু থামল মেয়েটা। কী যেন ভাবল। তারপর আবার বলল, "এই মহাবিশ্বে কেউ আমাদের স্বাগত জানিয়েছে, আবার কেউ এমন আচরণ করেছে যেন আমরা কোনও নোংরা আগাছা। অথবা কোনও ছোঁয়াচে রোগ। কিন্তু এই ঘৃণা, এই দ্বেষের শেষ কোথায়?" আমার কানের খুব কাছাকাছি ঠোঁট নিয়ে সে তার অদ্ভুত সুরে কী যেন বলে চলল। আমি সে ভাষার একটা বর্ণও বুঝলাম না। শুধু এতটুকু বুঝলাম যা শুনছি, তা আমার জীবনে শোনা মধুরতম কবিতা। আমি আগে কোনও দিন তা শুনিনি। ভবিষ্যতেও শুনব না। একটা বর্ণ না বুঝেও প্রতিটা শব্দ যেন আমার বহুকালের চেনা বোধ হচ্ছিল। মনে হল শব্দের এক অনন্ত মহাসাগরে আমি যেন নিঃসীম ভেসে চলেছি।

চমক ভাঙল ভিকের এক ধাক্কায়।

"শিগগির চল এখান থেকে। পালা এক্ষুনি।"

যেন শতসহস্র মাইল পেরিয়ে এক ধাক্কায় সেই ঘরে ফিরলাম। আমি চাইছিলাম সে কবিতার শেষটা শুনতে।

"পরে হবে। এখন ভাগ!" বলে আমার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে ভিক আমায় হলঘরে নিয়ে এল। আমি পিছন ফিরে কিচেনে তাকিয়ে ট্রায়োলেটকে খুঁজলাম। কিচেন ফাঁকা। কেউ নেই। শুধু সিঁড়ির মাথায় স্টেলা একলা দাঁড়িয়ে। গত তিরিশ বছরে সেই দৃশ্য আমি ভুলিনি। মৃত্যুর আগেও ভুলব না। স্টেলার চোখ... দেখে মনে হল গোটা বিশ্বের ক্রোধ যেন জ্বলন্ত অগ্নির মতো ঠিকরে বেরোচ্ছে সেই চোখ থেকে। অমন টকটকে লাল জ্বলন্ত চোখ পৃথিবীর কোনও প্রাণীর হয় বলে আমার জানা নেই।

আমরা পালালাম।

পার্টি, ট্যুরিস্ট, বাজনা সব ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে আমরা পালালাম। যেন তীব্র বজ্রপাতে দিশাহারা দুটি জীব। কীভাবে সেই গলির ভুলভুলাইয়া পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় এলাম মনে নেই। দেওয়ালে ভর দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ভিক শুধু বলল, "আরে এ তো আসলে..." বলেই দুদিকে জোরে জোরে মাথা নাড়তে থাকল।

"কিছু জায়গা আছে, যেখানে কোনও দিন যেতে নেই।"

দেখলাম ভিকের দুই চোখ বেয়ে জল ঝরছে। ছোট্ট বাচ্চার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ভিক। উপরের দোতলার ঘরে কী ঘটেছে আমি জানি না, কিন্তু যাই ঘটুক, তা তার অন্তরাত্মাকে নাড়িয়ে দিয়েছে চিরকালের মতো। সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। ভিক সামনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে। আর আমি পিছনে পিছনে সেই কবিতার সন্ধানে, যা আর কোনও দিন আমি শুনতে পাব না।

অনুবাদকের জবানি : নিল গাইম্যানের কাহিনি অনুবাদ যে-কোনো অনুবাদকের স্বপ্ন। এই গল্পটা How to talk to girls at parties প্রথমবার পড়েছিলাম কমিকস আকারে। গ্যাব্রিয়াল বা আর ফাবিও মুনের অসামান্য সেই রূপদান যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন।

বাঙালি পাঠকের কাছে গাইম্যান এখনও তত পরিচিত নাম নন। তাই কিশোর ভারতীর অনুবাদ সংখ্যায় এই গল্পটাই অনুবাদ করি আমি। এপার বাংলায় গাইম্যানের অনুবাদ সেই প্রথম।

পাকড়ো-ছোড়ো

অনেকদিন ধরে মাছ ধরলে জলকে চেনা যায়। চেনা যায় বিশাল দিঘির এক-একটা জায়গাকে... বহু বছর মাছ ধরার অভিজ্ঞতা থেকে সেই সব জায়গায় ফিরে আসতে হয় প্রতি বছর। নির্দিষ্ট ঋতুতে ঋতুতে। জানা যায় ঠিক কেমন পরিবেশ অপেক্ষা করছে সেখানে কিংবা কী চার জলে ফেললে মাছ আসবেই। এই সমস্ত কিছু ঠিকঠাক হবার পরে জলে চার ফেলে চলে অনন্ত প্রতীক্ষা... বাকিটা ভাগ্যের হাতে।

মাছ যদি চার না ঠোকরায়, তবে একসময় সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হয়। নতুন জায়গায়, নতুন মাছের সন্ধানে।

***

ডান দিকের লেনটা ধরে ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে একটা বড়ো এসইউভি চালিয়ে অন্য রাজ্যের দিকে পাড়ি দিচ্ছিল লোকটা। প্রতিটা লেন পেরোবার সময় এক-একবার সে গাড়ির গতি কমিয়ে দিচ্ছিল আপনা থেকেই। খেয়াল রাখছিল পথে কোনও হিচহাইকার গাড়ির লিফটের জন্য বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে কি না। সামনেই চারটে বড়ো বড়ো রাস্তার মোড়। এখানে প্রচুর ছাত্রদের জটলা। ওদের সবসময় কোথাও না কোথাও যাবার দরকার হয়। কেউ ক্যাম্পাস যাচ্ছে, কেউ বাড়ি ফিরছে... এত কোথায় যায় কে জানে! বুড়ো আঙুল দেখিয়েই রয়েছে। লোকটা চারটে রাস্তার মোড় পেরিয়ে গেল। সামনে আরও একটা রাস্তা। সেটা দিয়ে ঢুকে সোজা দক্ষিণমুখো যাত্রা করল সে। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। এসব কাজে তাড়াহুড়ো চলে না।

প্রতিটি মোড়ে মোড়ে হিচহাইকাররা দাঁড়িয়ে। তাদের অনেকেই জিনস আর ব্রা-বিহীন টিশার্টে বেশ সুন্দরী। কিন্তু লোকটা তার গতি কমাল না। প্রতিটি মেয়েই সঙ্গে একজন পুরুষ নিয়ে অপেক্ষা করছে। একা যারা তারা সবাই পুরুষ। লোকটা পুরুষে আগ্রহী না। ওর চাই মেয়ে। একা, অপেক্ষমাণ, সুন্দরী মেয়ে।

***

লুক- ৫.৫- "আমরা সারারাত মাছ ধরলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না।"

অনেকসময় সারাদিন গাড়ি চালাতে হয়, শুধু পেট্রোল ভরার জন্য থামতে হয় একবার। সত্যিকারের মাছ শিকারি সারারাত মাছ ধরতে গিয়ে কোনও মাছ না পেলেও ভাবে না তার সময়টা নষ্ট হল। তাকে শান্ত থাকতে হবে। মনকে নিয়ে যেতে হবে সেইদিনের ঘটনায়, যেদিন ছিপ ফেলেই সে বিরাট একটা মাছ ধরেছিল। কীভাবে চার ফেলা মাত্র মাছেরা খলবল করে দৌড়ে এসেছিল তার দিকে, কীভাবে সে তাদের খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তুলেছিল।

তারপর তপ্ত কড়াইতে ভেজেছিল।

***

লোকটা মেয়েটার জন্য দাঁড়াল। একলা মেয়ে। তাকে দাঁড়াতে দেখে মেয়েটা মাটিতে রাখা ব্যাকপ্যাক কাঁধে নিয়ে হেলেদুলে গাড়ির সামনে এল। লোকটা গাড়ির কাচ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল কোথায় যাবে। মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল,

যেন মনে মনে ঠিক করছে এর সঙ্গে যাওয়া উচিত কি না। তারপর প্রায় পঞ্চাশ- ষাট মাইল দূরের একটা শহরের নাম বলল।

"কোনও সমস্যা নেই," লোকটা বলল, "সামনের দরজা খুলে ঢুকে পড়ো।"

পিছনের সিটে ব্যাগটা ছুড়ে দিয়ে, সামনের দরজা খুলে মেয়েটা লোকটার পাশে বসে সিটবেল্ট আটকে নিল। ক্লিক আওয়াজ শোনা গেল স্পষ্ট। মেয়েটা বলে চলছিল ও কতটা কৃতজ্ঞ যে ওকে লিফট দেওয়া হল, লোকটিও যথাসাধ্য উত্তর দিয়ে চলছিল, কিন্তু ওর মন ভাবছিল অন্য কথা। গাড়িতে ওঠার ঠিক আগে মেয়েটা কী ভাবছিল? কীভাবে মেয়েটা বুঝল যে ওকে বিশ্বাস করা যায়? ও দেখতে একেবারে সাধারণ। অন্য দশটা মানুষের থেকে আলাদা করা যাবে না কোনও মতেই। অনেকদিন আগে ও একবার গোঁফ রেখেছিল। ভেবেছিল, এতে ওর ব্যক্তিত্ব বাড়বে। পরে দেখল এসবে কিছু হয় না। তাই কামিয়ে ফেলেছিল।

আবার ফিরে গেছিল সেই মুখে, যা বৈশিষ্ট্যহীন, সাধারণ... দেখলেও আলাদা করে মনে রাখা যায় না।

***

"আপনিও মাছ ধরেন? আমার বাবা মাছ ধরে, জানেন তো", মেয়েটা বলছিল, "বছরে এক দুবার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সপ্তাহান্তে বাবা মাছ শিকারে যায়। ফিরে আসে বাক্সভরা বরফে ঠাসা মাছ নিয়ে। মা সেগুলোকে নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে। প্রায় এক হপ্তা জুড়ে সারা বাড়িতে কেমন একটা মাছ মাছ গন্ধ ছাড়ে।"

"না না, আমি তেমন নই। আমি হলাম সেইরকম মাছ শিকারি, যাকে লোকে পাকড়ো-ছোড়ো মাছুয়া বলে।"

"আপনি বাড়িতে বরফের বাক্স ভরে মাছ নিয়ে আসেন না?"

"আমার বরফের বাক্সই নেই। মানে ছিল এককালে। তারপর আমি দেখলাম শিকারের মজা শিকার করাতেই। আমি মাছ ধরি, মুখের থেকে বঁড়শিটি খুলে নিয়ে আবার তাকে সযত্নে জলে ছেড়ে দিই।"

মেয়েটা খানিক চুপ রইল। যেন এই ব্যাপারটা বেশ আমোদ দিল ওকে।

"কিন্তু মাছের কেমন লাগে? মাছ কি মজা পায়? জানি না", লোকটা বলে চলে, "এটাও জানি না মাছের ক্ষেত্রে আদৌ মজা পাওয়া ব্যাপারটা প্রযোজ্য কি না। মাছেরা যখন বাঁচার জন্য ছটফট করে, নিঃশ্বাস নেবার জন্য প্রাণপণ লড়াই চালায়, সেটা কি তাদের মজার লাগে? মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, যখন তাদের ছেড়ে দিই আর তারা সাঁতরে চলে যায়, তখন আমার কেন যেন মনে হয় এই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে ওরা খুশি। আমি নিজে কোনও দিন ওদের জায়গায় আসিনি... তাই সঠিক বলা মুশকিল।"

"আমার মনে হয় মজা পায় না।"

"শুধু একটা জিনিস ভাবি, এর পরের বার আবার মুখের সামনে একটা বঁড়শি এলে ওই মাছটা কি পালাবে? না আবার স্বেচ্ছায় বঁড়শি গিলে নেবে, এই ভেবে যে, সেই মাছ শিকারি আবার ওকে ছেড়ে দেবে।"

মেয়েটা অনেক ভেবে বলল, "ওরা তো আর মানুষ না, মাছ। এতটা কি ভাববে?"

"ঠিক বলেছ", লোকটা বলল, "হক কথা।"

***

মেয়েটা দেখতে দারুণ সুন্দর। বিজনেস ইকনমিক্স নিয়ে পড়ছে। পড়তে খুব ভালোবাসে আর তাই বেশিরভাগ বিষয় ইংরেজিতেই পড়ে। মাথার চুল বাদামি, সুন্দর ফিগার, পীনোন্নত স্তনযুগল, ভারী নিতম্ব। "সন্তানধারণের জন্য আদর্শ" লোকটা ভাবে। তিনটে চারটে বাচ্চা হবে আর প্রতিবার বাচ্চা হবার সময় ওজন একটু একটু বাড়বে। শেষে ওজনের উপর আর কোনও রাশ থাকবে না। আর মুখটা, এখনই বেশ গোলগাল। তখন তো থ্যাবড়া হয়ে বিচ্ছিরি হয়ে যাবে। চোখের এই উজ্জ্বল ভাবটাও নষ্ট হবে একেবারে। এখনও সময় আছে মেয়েটাকে কুৎসিত হবার থেকে রক্ষা করার…

***

"আপনি প্লিজ ওই মোড়টায় আমাকে ছেড়ে দিন", মেয়েটা একটা রাস্তা দেখিয়ে বলল।

"ওহহ, আমরা পৌঁছে গেছি?"

"হ্যাঁ, একদম। একটু সাইড করে দাঁড়িয়ে যান। আমি কোনাটায় নেমে যাব…"

কোনায় একটা একটেরে বাড়ির সামনে দাঁড়াল গাড়িটা। মেয়েটা পিছন থেকে ব্যাকপ্যাক নামিয়ে নিল। লোকটাও কিছুটা এগিয়ে দিল ওকে। বিদায় নেবার সময় আচমকা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, একটা কথা ছিল। আগেই বলতাম। কিন্তু তোমায় আপসেট করতে চাইনি।"

"বলুন।"

"এই যে তুমি অচেনা লোকের গাড়িতে এতটা হিচহাইক করে এলে, তোমার ভয় করল না?"

"ভয়ের কী আছে? সবাই তো করে…"

"তা করে, কিন্তু তুমি একজন সুন্দরী মেয়ে… এভাবে একা একা…"

"আমি একা কোনও দিনও আসি না, দুই বা তিনজন মিলে আসি। এই প্রথমবার একা এলাম।"

"তার মানে তুমি বেশ ঝুঁকি নিয়েছ, বলো…"

"তাতে কী? সব তো ঠিকঠাকই গেল।"

লোকটা খানিক চুপ রইল। তারপর মেয়েটার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, "মাছ ধরার গল্পটা মনে আছে তো? মাছকে জলে ছেড়ে দিলে সেই মাছের কেমন লাগে… মনে রেখো সবাই কিন্তু আমার মতো পাকড়ো-ছোড়ো মেছুয়া হয় না।"

গাড়ি ঘুরিয়ে লোকটা যখন রাস্তায় উঠল, মেয়েটা তখনও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

***

বাড়িতে যখন ফিরল লোকটা, তার মন খুশিতে ভরা। এই বাড়িতেই তার জন্ম। দশ বছর আগে মায়ের মৃত্যুর পর এক রাতও সে এই বাড়ির বাইরে কাটায়নি। ডাকবাক্স খুলে দেখল খান ছয়েক চিঠি। সবকটাই মাছ ধরার কোনও না কোনও সরঞ্জামের অর্ডার। ও জানে এই ব্যবসাটা অনলাইনে করে খদ্দেরদের ক্রেডিট কার্ডে টাকা মেটাতে বললে লাভ অনেক বেশি, কিন্তু ওর খুব বেশি টাকার দরকার নেই। বরং যা চলছে, যেমন চলছে, সেটাই ভালো। সে মাসে মাসে একই ম্যাগাজিনে একই বিজ্ঞাপন দেয়, সেই পুরোনো

খদ্দেররাই জিনিসের অর্ডার দিয়ে চলে, মাঝে মাঝে দু-একটা নতুন খদ্দেরও পাওয়া যায় বইকি।

একটু বিশ্রাম নিয়ে বড়ো এক প্লেট পাস্তা বানাল সে, সঙ্গে মাংসের সুরুয়া আর লেটুস দেওয়া স্যালাড। স্যালাডে অল্প অলিভ অয়েল ছড়িয়ে দিল স্বাদের জন্য।

রান্নাঘরের টেবিলে বসে খেয়ে, থালাবাসন ধুয়ে, টিভি-তে খবর দেখতে বসল লোকটা। খবর শেষ হলে আওয়াজটা কমিয়ে আজকের মেয়েটার কথা ভাবতে লাগল। কল্পনায় দেখতে থাকল ফাঁকা রাস্তা, তাতে একলা মেয়েটা, মুখে টেপ দিয়ে আটকানো, দুটো ভাঙা হাত নিয়ে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা চালাচ্ছে। ধীরে ধীরে মেয়েটার গায়ের সমস্ত জামাকাপড় খুলে নিল সে। মেয়েটার শরীরের সবকটা ছিদ্রতে বিঁধিয়ে দিল ধারালো অস্ত্র। যন্ত্রণা আর তার সঙ্গে ভয়... এই না হলে চলে!

মেয়েটার ভবযন্ত্রণা ঘোচাল ধারালো ছুরির এক মোচড়ে। না, না... নিজের হাতে গলা টিপে। ওর ডান হাত মেয়েটার গলায়, চাপ আস্তে আস্তে বাড়ছে... মেয়েটার নিঃশ্বাস জোরে হতে হতে বন্ধ হয় গেল... আঃ কী আনন্দ!! আবেশে লোকটার চোখ মুদে এল। যেন সত্যি সত্যি ঘটনাটা ঘটেছে।

কিন্তু আদতে কিচ্ছু ঘটেনি। সে নিজের দরজার বাইরে বেরোয়নি। আর তাই কোনও বরফের বাক্স নেই, কোনও দেহ নেই, এক হপ্তা ধরে পরিষ্কার করার ঝামেলা নেই।

এটাই এই খেলার মজা। পাকড়ো— ছোড়ো। পাকড়ো— ছোড়ো। ব্যস...

***

ভাঁটিখানাটার একটা নাম আছে, টডল ইন। কিন্তু কেউ একে ওই নামে ডাকে না। সবাই একে রয়ের ভাঁটিখানা বলে। লিভারের অসুখে মারা যাবার আগে প্রায় পঞ্চাশ বছর রয় এই দোকানের মালিক ছিল। গত পরশু সেই সুন্দরী হিচহাইকারকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার পর আজ লোকটার একটু ভাঁটিখানায় যেতে ইচ্ছে হল। এটা তার চার নম্বর ভাঁটিখানা। প্রথমটায় সে একটা বিয়ার খেয়েছিল, দ্বিতীয়তে কোনও অর্ডার না দিয়েই বেরিয়ে আসে, তৃতীয়তে শুধু এক গ্লাস কোকাকোলা। এখানেও এক গ্লাস বিয়ারের অর্ডার দিয়ে লোকটি অপেক্ষা করতে লাগল। একটা গান মনে পড়ল আচমকা—

এক পাঁইট বিয়ারে

আধা পাঁইট জল,

ভাঁটিখানা মালিকের

বুদ্ধির ফল।

এই বিয়ারটাও কেমন জলজলে। কিন্তু বিয়ার নিয়ে ওর কোনও আগ্রহ ছিল না। আগ্রহ ছিল যার জন্য ও এখানে এসেছে... সেটা নিয়ে।

দুটো টুল দূরেই মেয়েটা বসে। আচমকা দেখলে মনে হয় সেই হিচহাইকার মেয়েটা কিংবা ওর বড়দি। কিন্তু ভালো করে খেয়াল করলে ভুল ভাঙে। এর ব্লাউজটা অনেকটাই ছোটো, সেই অভাব পূরণ করতে উপরের দুটো বোতাম খামোখা খুলে রাখা। হাতে লম্বা ডাঁটিওয়ালা গেলাস, উপরে কমলালেবুর খোসা ভাসছে। ঠোঁটের লিপস্টিক জ্যাবরানো, নখের নেলপলিশ এদিক ওদিক থেকে উঠে গেছে।

মেয়েটা চুমুক দিতে গিয়ে দেখল গ্লাস খালি। বেশ অবাক হয়েই কী করবে ভাবছে, এমন সময় লোকটা হাত দিয়ে বারম্যানকে ইশারা করে মেয়েটার গ্লাস ভরে দিতে বলল। প্রথম চুমুকটা দিয়ে মেয়েটা ওর দিকে তাকাল।

"ধন্যবাদ, আপনি সত্যিকারের ভদ্রলোক।"

"আমি এক মাছ শিকারি", মেয়েটির কাছে ঘেঁষে বসে বলল লোকটা।

***

কোনও কোনও সময় চারে কী আছে তা ভাবার দরকারই হয় না। অনেকসময় বঁড়শিতে চার দিয়ে জলেও ফেলতে হয় না। নৌকায় বসে থাকলেও মাছ লাফ মেরে নৌকাতে উঠে আসে। দরকার স্রেফ কপালের জোর।

লোকটা কিনে দেবার আগেও মেয়েটা বেশ কয়েকটা ড্রিংক নিয়েছিল। হয়তো আরও দুটো না হলেও চলত, তবু নিল। লোকটারও বসে থাকতে বা পয়সা খরচা করতে কোনও আপত্তি ছিল না।

মেয়েটার নাম মার্নি। বারবার বলছিল। যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও কথা, মনে না রাখলে অনর্থ হয়ে যাবে। "আমার নাম জ্যাক", মিথ্যে বলল লোকটা। মেয়েটা বারবার ক্ষমা চাইল। অনেক চেষ্টা করেও লোকটার নাম ও মনে রাখতে পারছিল না। বরং আবার বলল, "আমার নাম মার্নি। শেষে আই আছে।"

ওর মনে পড়ল বহু বছর আগে ঠিক এমনই এক বারে এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নেশায় আস্তে আস্তে তার চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসছিল, কথা কমে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। লোকটার গাড়ি চেপে নির্দিষ্ট জায়গায় আসার আগে গাড়িতেই মেয়েটা জ্ঞান হারিয়েছিল। লোকটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল জ্ঞান আসার। আসেনি দেখে বিরক্ত হয়ে হালকা হাতে মেয়েটার ঘাড় মটকে মেরে ফেলেছিল সেদিন। মেয়েটা বুঝতেই পারেনি। যেন ঘুমিয়েই আছে...

সেটাও মন্দ অভিজ্ঞতা না...

***

"আমার তো নিজের বাড়ি আছে", মেয়েটা বলে চলছিল, "তবু আমার প্রাক্তন স্বামী আমার বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেছে। আমি নাকি অযোগ্য মা। আচ্ছা বলুন তো, আমাকে কি আপনার অযোগ্য বলে মনে হয়?" যে বাড়িতে মেয়েটা থাকে সেটা একেবারে নোংরা না হলেও প্রচণ্ড অগোছালো। মেয়েটা তাকে হাত ধরে গোটা সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছে। এনেই সোজা বেডরুমে। বেডরুমও তথৈবচ। ঢুকেই মেয়েটা সোজা লোকটাকে জড়িয়ে ধরল জাপটে।

লোকটা তাকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিল। মেয়েটা অবাক। লোকটা জিজ্ঞেস করল পান করার মতো ঘরে কিছু আছে কি না। মার্নি জানাল ফ্রিজে পুরোনো এক বোতল ভদকা আর বিয়ার থাকতেও পারে। মার্নিকে ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দিল সে। হাতে বিয়ারের বোতল নিয়ে যখন ঢুকল তখন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে মেয়েটা বিছানায় উপর হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। নাক ডাকছে ধীরে ধীরে।

লোকটা ওর খুব কাছে গিয়ে গায়ে কম্বল ঢেকে দিল।

"পাকড়ো— ছোড়ো" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

***

মাছ ধরা শুধু একটা বাহানা না। দিন দু-এক বাদে এক শীতের শরৎ সকালে লোকটা দরজা খুলেই দেখল আকাশ মেঘে ঢাকা। পশ্চিম দিক থেকে শনশন করে বাতাস বইছে। আজ একেবারে উপযুক্ত দিন। গাড়ি চালিয়ে সে চলে গেল নদীর এক নির্জন খাতে। প্রায় সারাদিন সেখানে বসে থেকে বড়ো ছিপ নিয়ে ধরল তিনটে ট্রাউট মাছ। প্রতিটাই প্রচণ্ড লড়াই চালিয়েছিল। শেষে যখন ও তাদের ছেড়ে দিল, ওদের প্রশান্তি যেন লোকটার মধ্যেও ভর করল।

আচ্ছা মাছেরা কি আর-একটা জীবনের দাবি রাখতে পারে? কিংবা ও কি সত্যিই মাছেদের নতুন জীবন দিল? সে ক্ষমতা কি ওর আছে? কিছু কিছু মাছ তো জল থেকে ওঠালেই মরে যায়। একবার ঘাই মারতেও পারে না। তারা জলের তলায় থাকে। তাদের ইচ্ছে করলেও লোকটা নতুন জীবন দিতে পারবে না। তার মানে কি সেসব মাছ ট্রাউটের থেকে জীবনসংগ্রামে শুরুতেই পিছিয়ে পড়ল?

এসব ভাবতে ভাবতে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে লোকটা গাড়ি দাঁড় করাল। একটা হ্যামবার্গার আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেল সস মাখিয়ে। সঙ্গে এক কাপ কফি খেতে খেতে সেদিনের পত্রিকাটাও পড়ে নিল।

বাড়ি ফিরে ছিপ, বঁড়শি সব ধুয়ে মুছে সাফ করে রেখে দিল যেখানকার জিনিস ঠিক সেখানে।

***

সেদিন রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হল। চলল টানা তিনদিন। এই তিনদিন লোকটা ঘর থেকে বেরোতে পারল না। সারাদিন সোফায় বসে টিভি দেখে সময় কাটে। রাতে সে চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকে। কয়েক মাস আগেই ও একবার গুনবার চেষ্টা করেছিল। এই কাজ সে অনেকদিন ধরে করছে। মা মারা যাবার অনেক আগে থেকে। প্রথমদিকে ওর খিদে ছিল দুরন্ত। কিছুতেই বাগ মানত না। মাঝে মাঝে নিজেও অবাক হয়ে ভাবে, কেন ও এতদিন ধরা পড়েনি! প্রথমদিকে তো ডিএনএ থেকে শুরু করে কতরকম প্রমাণ ছড়িয়ে আসত অকুস্থলে তার ঠিক নেই।

তবে হ্যাঁ, ও ঠিক করে নিয়েছিল, কোনও দিন যদি ধরা পড়ে, সব স্বীকার করে নেবে। কোনও ডিএনএ, কোনও প্রমাণ লাগবে না। ওকে জেলে ঢুকিয়ে তালা মেরে চাবি ছুড়ে ফেলে দিলেও ও কিছু বলবে না। ও অন্যদের দেখেছে। কীভাবে অন্যরা একই ধরনের মহিলাদের একইভাবে খুন করে, আর কিছুদিন বাদে ধরা পড়ে যায়। অন্যদের থেকে ও যদি কোথাও আলাদা হয়, তবে তা বৈচিত্র্যে। এমন না যে ধরা পড়ার ভয়ে এটা করে। একই ধরনের মেয়েরা ওকে বোর করে দেয়। বৈচিত্র্যই তো জীবনের অঙ্গ... নাকি মৃত্যুরও? মে ওয়েস্ট একবার বলেছিলেন, "দুটো শয়তানের মধ্যে আমি সেটাকেই বাছব যেটাকে আমি আগে দেখিনি।"

তারপর একদিন ও পাকড়ো-ছোড়ো মেছুয়া বনে গেল। সেদিন থেকে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও শূন্য হল একেবারে। একসময় ও মেয়েদের খুন করত, কারণ ওর মনে হত খুনটা প্রয়োজনীয়। এখন করে না, কারণ ওর মনে হয় সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বরং নেশাগ্রস্তরা যেমন নেশা ছাড়ার পরও কোনওভাবে নেশার দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে, ও ঠিক সেই কারণেই পাকড়ো-ছোড়ো খেলা খেলে।

কতজনকে ও খুন করেছে? সত্যি বলতে, ও নিজেও জানে না। ও খুন করে মৃতদের কোনও চিহ্ন নিজের কাছে রাখে না। আর ওর স্মৃতি? এখন বাস্তব আর কল্পনা মিলেমিশে এমন হয়েছে যে কোন খুনটা সত্যি আর কোনটা ও কল্পনা করেছে, তা বলা মুশকিল। আর তার দরকারই বা কী?

ওর সেই টেক্সাস সিরিয়াল কিলারের কথা মনে পড়ে। যে-কোনো খুন হলেই সেই খুনি পুলিশের কাছে স্বীকার করত যে সে এটা করেছে। শেষে তো এমন হল যে দেখা গেল এদের মধ্যে কিছু খুন যে সময় হয়েছে, তখন ও পুলিশের গরাদে বন্দি। লোকটা মনে মনে ভাবে ওই খুনির ক্ষেত্রেও কি বাস্তব আর কল্পনা এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছিল, যে, একসময় সে নিজেই বুঝতে পারছিল না কোন খুনটা সে করেছে আর কোনটা করেনি?

***

লোকটা বৃষ্টিকে পরোয়া করে না। ওর ছোটোবেলা একলা কেটেছে। বড়োবেলাও। ওর কোনও বন্ধু নেই। দরকারও হয়নি কোনও দিন। মাঝে মাঝে ওর সামাজিক হবার ইচ্ছে জাগে। তখন ও শপিং মলে যায়, সিনেমা হলে যায়, বারে সময় কাটায়... তবে বেশিরভাগ সময় ওর সঙ্গী ও নিজেই। সেই বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় ও তাক থেকে একটা বই নামাল। ইসাক ওয়াল্টনের লেখা "দি কমপ্লিট অ্যাংলার।" এ বই মলাট থেকে মলাট কতবার যে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই, তবু প্রতিবার যেন মনে হয় নতুন কিছু খুঁজে পাবে।

"ঈশ্বর মাছধরার মতো এত শান্ত, সমাহিত আর নির্দোষ বিনোদন আর দুটি তৈরি করেননি", ও জোরে জোরে পড়ল। এ যেন ওর নিজের মনের কথা। তবে অ্যাংলার শব্দটার চেয়ে ফিশারম্যান শব্দটা ওর অনেক বেশি পছন্দের।

বৃষ্টি কমতেই ও একটা লম্বা লিস্ট বানিয়ে সোজা শপিং মলে চলল। চাকাওয়ালা গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে একধার থেকে ডিম, বেকন, পাস্তা, ক্যানের সস নিয়ে ডিটারজেন্ট সাবান কিনতে গিয়েই মেয়েটাকে দেখল সে। ও মেয়ে দেখতে আসেনি। শুধু বাজার করতেই এসেছিল। তার মাথায় ডিটারজেন্ট ছাড়া কিছু ঘুরছিল না, তবু সে মেয়েটাকে দেখেই ফেলল।

মহিলা সত্যিকারের সুন্দরী। সেই হিচহাইকারের মতো অল্পবয়েসি বা মার্নির মতো গায়ে পড়া না। খাঁটি সুন্দরী যাকে বলে। যেমন কোনও অভিনেত্রী বা মডেল হয় আর কি। কিন্তু লোকটা নিশ্চিত জানত এ দুটোর কোনোটাই নয়।

একঢাল লম্বা কালো চুল, দীর্ঘ পা দুটো, টিকালো নাক, দৌড়বিদের মতো সুন্দর ফিগার আর সব মিলিয়ে এমন কিছু একটা ছিল যা নিমেষে লোকটার মনকে তার কেনাকাটার জিনিসপত্র থেকে সরিয়ে পুরোপুরি সেই মহিলার উপরে নিয়ে গেল। মহিলার পরনে স্ল্যাক্স আর টিশার্টের ওপর বোতামহীন শার্ট। পোশাক মোটেই উত্তেজক না, তবু পোশাকে কী আর আসে যায়! মহিলার হাতে লম্বা কেনাকাটার লিস্ট, যার সামান্যই কেনা হয়েছে। লোকটা বুঝল, তার হাতে সময় আছে। আস্তে ধীরে নিজের চাকাওয়ালা কার্ট ঘুরিয়ে দোকানির কাছে গিয়ে নিজের কেনা জিনিসের টাকা মিটিয়ে দিল সে।

বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে সব মালপত্র ভরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শপিং মলের গেটের দিকে। তার এসইউভি-র পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধৈর্য হারালে চলবে না। কোনও না কোনও সময় স্লাইডিং ডোর খুলে মহিলা বেরোবেই। অস্থির হবার কিছু নেই। অস্থির মানুষরা মাছ শিকারি হতে পারে না। যারা খাঁটি মাছ শিকারি, তারা এই বসে থাকা, এই অপেক্ষাতেই চরম উত্তেজনা খুঁজে পায়।

প্রতিবার ছিপ ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই যদি মাছে এসে ঠোকরাত, তাহলে খেলার আনন্দটাই মাটি। তার চেয়ে তো জাল দিয়েই মাছ ধরা যায়। কিংবা জলে একটা গ্রেনেড ফেলে সব মাছ একসঙ্গে মেরে দেওয়া যায়। তাকে কি আর খেলা বলা চলে?

এই তো, বেরিয়েছে...

***

"আমি এক মাছ শিকারি" বলেই হাত বাড়াল লোকটা।

এটা অবশ্য মহিলাকে বলা প্রথম কথা ছিল না। প্রথম কথা ছিল, "অনেক জিনিস আপনার, দাঁড়ান সাহায্য করি।" মহিলা তখন গাড়িতে জিনিস ঢোকাতে ব্যস্ত। লোকটার বাড়িয়ে দেওয়া হাত দেখে হালকা হেসে ধন্যবাদ বলার পর আর কিছু বলার সুযোগই পেল না। নিপুণ হাতে লোকটা মেয়েটার মাথায় এমন এক আঘাত করল যে তার গোটা শরীর ঢলে পড়ল লোকটার গায়ে, আর সেও মাটিতে পড়ে যাবার আগে সযত্নে মহিলাকে তুলে নিজের গাড়িতে শুইয়ে দিল। মহিলার গা ঠান্ডা হয়ে গেছে। মারটা কি জোরে হয়ে গেল? লোকটা মহিলার নাড়ি দেখল। নাঃ... বেঁচে আছে। মোটা টেপ দিয়ে সে মহিলার হাত পা মুখ বেঁধে দিল। আটকে দিল সিটবেল্ট। তারপর গাড়ি ছোটাল।

সুপার মার্কেটের সামনে যে অসীম ধৈর্য নিয়ে সে মহিলার বেরোনোর অপেক্ষা করছিল, ঠিক সে ধৈর্য নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল মহিলার জ্ঞান ফেরার। "আমি এক মাছ শিকারি", সে মনে মনে বলতে লাগল। গাড়ি চালাতে চালাতে মাঝে মাঝেই দেখছিল মহিলার দিকে। কোনও হেলদোল নেই। চোখ বন্ধ, শরীর এলিয়ে পড়া।

একটু বাদে বড়ো রাস্তা ছেড়ে পাশের ছোটো রাস্তায় ঢুকল সে। এবার সে সামান্য একটা পরিবর্তন খেয়াল করল। আপাতদৃষ্টিতে সব আগের মতো। কিন্তু কোথাও একটা প্রাণের সাড়া আছে। লোকটা ঠিক এই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিল। নীরবতা ভেঙে মহিলাকে জানাল সে এক মাছ শিকারি। মহিলা সাড়া দিল না। কিন্তু সে নিশ্চিত ছিল, মহিলা তার কথা শুনতে পেয়েছে।

"আমি পাকড়ো-ছোড়ো মাছুয়া। অনেকেই এই ধরনের মাছ শিকারির কথা জানেন না। আমি মাছ ধরতে ভালোবাসি। এতে আমি এমন এক আনন্দ পাই, যা আর অন্য কিছুতে পাই না। খেলা বলুন খেলা, সময় কাটানো বলুন সময় কাটানো... কিন্তু এটাই আমি করে থাকি। চিরকাল করে এসেছি।"

বলেই লোকটা ভাবতে থাকল। চিরকাল করে এসেছে? ওর মনে পড়ল একেবারে ছোটোবেলার কথা। হাতে কঞ্চির ছিপ আর দড়িতে বাঁধা বঁড়শি নিয়ে বাড়ির পিছনের ডোবায় মাছ ধরতে যেত সে। আর বড়ো হবার পর অন্য ধরনের মাছ ধরা। এতে যে উৎসাহ সে পেয়েছে, তেমন আর অন্য কিছুতে পায়নি।

"আমি চিরকাল এমন পাকড়ো-ছোড়ো মাছুয়া ছিলাম না, জানেন তো! মানুষ মাছ ধরে কেন? আগে আমিও ভাবতাম এত খাটনি করে মাছ ধরার একটাই মানে, মেরে ফ্যালো। মেরে খেয়ে নাও। একেবারে সোজা হিসেব, কী বলেন?"

"কী বলেন?" মহিলা কোনও উত্তর দিল না। উত্তর দেবার অবস্থায় সে নেই। তার মুখ বাঁধা মোটা টেপ দিয়ে। তার যে চোখ এতক্ষণ বন্ধ ছিল, তা এখন খোলা। চোখে কোনও অভিব্যক্তি নেই।

“তারপর কী হল একদিন”, লোকটা বলে চলল, “আমি এই সব কিছুতে উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম। এই খুনখারাপি ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে লোকে ভাবে জল থেকে ওঠালেই হয়তো মাছ মরে যায়। তা নয়, মাছ খাবি খেতে থাকে। ছটফট করে, কিন্তু আমরা যতটা ভাবি, তার থেকেও বেশি সময় বাঁচে। অনেকসময় মাথায় একটা মুগুরের বাড়িতেও মরে না। লেজ ছটচফটায়। কিন্তু তারপরেই আসল ঝামেলা। সেই মাছকে ধুতে হবে, কাটতে হবে, অন্ত্রগুলোকে ফেলে পরিষ্কার করে হবে...”

গাড়ি এবার কাঁচা রাস্তা ধরেছে। অনেকদিন ও এই রাস্তায় আসেনি। কিন্তু এ রাস্তা ওর বহুদিনের চেনা। রাস্তার শেষে বনের মাঝে এমন একটা নির্জন জায়গা আছে, যেটা ওর খুব প্রিয়।

লোকটা এখন চুপ। একটাও কথা বলছে না। বরং মহিলাকে ভাবার সময় দিচ্ছে। ভাবুক, ও কী বলল সেটা ভেবে দেখুক। গাড়ি চালিয়ে বনের মাঝে এমন এক জায়গায় গাড়ি থামাল যেটা কোনওমতেই বাইরে থেকে দেখা যাবে না।

“আমি আপনাকে সত্যি কথা বলি”, মেয়েটার সিটবেল্ট খুলে ওকে নামাতে নামাতে লোকটা বলতে লাগল, “আমার বরং মাছ মারার চেয়ে এই পাকড়ো-ছোড়ো খেলা অনেক বেশি উত্তেজক লাগে। বিশ্বাস করুন...”

খুব যত্ন করে মহিলাকে মাটিতে শুইয়ে দিল সে। তারপর গাড়ির চাকা খোলার লোহার রডটা দিয়ে দুই হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে ফেলল। ফেলেই পায়ের টেপটা খুলে দিল সে। হাত আর মুখের টেপটা আগের মতোই রইল। একটা ধারালো ছুরি দিয়ে মেয়েটার সব পোশাক একে একে কেটে ফেলল হালকা হাতে। নিজের সমস্ত পোশাক খুলে পাশে গুটিয়ে রাখল যত্ন করে। আদম আর ইভ যেন স্বর্গের উদ্যানে, ভাবল লোকটা। নগ্ন, কিন্তু লজ্জিত না। হে ঈশ্বর, “আমরা সারারাত মাছ ধরলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না।”

এবার সে মহিলার উপরে হামলে পড়ল।

***

বাড়ি ফিরে এসে নিজের সব পোশাক ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিল লোকটা। তারপর স্নান করল অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু তার আগে একেবারে সরাসরি বাথটবে নামল না। ওর সারা গায়ে তখনও সেই মহিলার গন্ধ লেগে আছে। ও চাইছিল না, অতি দ্রুত সে গন্ধ চলে যাক। বরং বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার সেই উত্তেজক সময়কে উপভোগ করতে লাগল মনে মনে। একেবারে শুরুতে মেয়েটাকে সুপার মার্কেটে দেখা থেকে শেষে ওর ঘাড়টা মটকে দেওয়া অবধি... গোটা ব্যাপারটাকে বারবার স্মৃতিতে জারিয়ে নিতে চাইল।

ওর মনে পড়ল প্রথম যেবার ও নিজেই এই পাকড়ো-ছোড়ো খেলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেই মেয়েটাও একেবারে নিপুণভাবে গড়া ছিল। তরুণী, ব্লন্ড, চিয়ারলিডারের মতো দেখতে, গালে একটা তিল... যখনই ওর পছন্দের মেয়েদের দেখতে পায়, ও এই খেলা থেকে বেরিয়ে আসে। এই খেলার নিয়ম তো ওরই বানানো, তাই কখন খেলবে আর কখন খেলবে না, সেটাও ও ঠিক করবে, অন্য কেউ না।

একটু খারাপ লাগছিল শুরুতে। আজকের খেলাটা নিয়ম মেনে হল না। তবু পরে সেসব ভুলে অদ্ভুত এক শরীর জোড়া প্রশান্তি তাকে আবিষ্ট করল। সে কিন্তু এখনও পাকড়ো-ছোড়ো মেছুয়াই আছে। সারা জীবনই থাকবে। কিন্তু তা বলে কি ও নিরামিষাশী হয়ে গেল নাকি?

ছিঃ... কক্ষনো না। সবার অধিকার আছে অন্তত দুই-একদিন ভরপেট চর্ব্য চোষ্য খাবার খাওয়ার...

অনুবাদকের জবানি : নিল গাইম্যান আর আল সারান্তোনিও-র সম্পাদনায় Stories : All-New Tales বইটি ২০১০ সালে প্রকাশ পায়। কালিম্পং প্রবাসকালে ওই বছরই বইটি হাতে আসে আমার। বইতে প্রতিটা গল্প নতুন, এই বইয়ের জন্যেই লেখা। এক-একটা গল্প এক-এক ঘরানার। কিন্তু সবকটারই একটা ব্যাপার এক... পড়তে পড়তে প্রায় প্রতি পাতায় মনে হবে "তারপর কী হল?" নিল গাইম্যান তাঁর ভূমিকাতেও লিখেছেন লেখকের নাম বা লেখার গুণ না, একমাত্র এই বৈশিষ্ট্যটা আছে কি না দেখেই গল্পগুলো নির্বাচন করা হয়েছে।

লরেন্স ব্লক প্রবীণ লেখক, এবং বিখ্যাতও। আমেরিকার মিস্ট্রি রাইটার অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে গ্র্যান্ড মাস্টারের খেতাবও দিয়েছেন। ম্যাথু স্কুডার বা এক চোর বার্নি রডেনবার্গকে নিয়ে তাঁর সিরিজ আমেরিকায় বেস্টসেলার। কিন্তু এই গল্পটি, যার আসল নাম 'Catch and Release', তাঁর নিজস্ব ঘরানা থেকে একেবারে আলাদা। একে ঠিক ক্রাইমের গল্প বলা যায় না। বরং ভিতরে ভিতরে এক চাপা আতঙ্কের ধারা প্রথম থেকে বয়ে চলে। আর গাইম্যান যেটা বলেছিলেন, তারপর কী হল... সেটা তো আছেই। বাহাত্তর বছর বয়েসে ব্লক নিজেকে ভেঙে দুরন্ত এক গল্প উপহার দিলেন পাঠককে।

সাজাঘর

ডমিনিক প্যাটাগ্লিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করছিল, সাজাঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসা আর্তনাদকে উপেক্ষা করতে। কিন্তু কপাল মন্দ। সিলিং-এ লাগানো প্রতিটা লাউড স্পিকার একেবারে চরমে বাড়ানো। এই আর্তনাদ প্রায়ই ভেসে আসে... জান্তব পাশবিক চিৎকার। তীক্ষ্ণ, কানে তালা লাগানো। মাঝেমধ্যে কাকুতিমিনতির কিছু শব্দ জড়িয়ে না থাকলে এ চিৎকার যে মানুষের তা বোঝা দুষ্কর।

এখানে দয়ামায়া শব্দটাই অজানা।

ডমিনিক দুই হাত দিয়ে সজোরে নিজের কান চেপে ধরল। কিন্তু সেই আর্তস্বর যেন তার হাতের চামড়া, মাংস ভেদ করে কানের পর্দায় ধাক্কা মারছে। চিৎকারের ফাঁকে ফাঁকে যে কিচকিচে শব্দ আসছিল, তাতে ডমিনিক বুঝতে পারল আজ ওরা স্ক্রু ব্যবহার করছে। দেহের প্রতিটা গাঁটে গাঁটে শক্ত করে এঁটে বসিয়ে দিচ্ছে কাঠের ক্লাম্প, যাতে হাড়মজ্জা সব পিষে যায়।

প্রায়ই হাড়ে চিড় ধরে। কিছুদিন রাজনৈতিক গরমাগরম আলোচনা হয়, বিভিন্ন সহমর্মী দলগুলো প্রতিবাদী চিঠির বন্যা বইয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ সেইসব চিঠিদের জায়গা হয় ফায়ারপ্লেসের আগুনে।

আইনে পরিষ্কার বলা আছে সাজা দিতে গিয়ে যেন শরীরে স্থায়ী কোনও ক্ষতি না হয়। এ ব্যাপারে গভর্নর খুব কড়া। শিক্ষাদান করতে গেলে এসব হ্যাপা খুব অসুবিধে সৃষ্টি করে।

আবার আর্তনাদ। যেন একটা শুয়োরকে খুন করা হচ্ছে। ডমিনিক দুই চোখ জোরে চেপে রইল। সে এই স্ক্রু-র যন্ত্রণা জানে, জানে এর থেকেও ভয়াবহ সব যন্ত্রের অভিজ্ঞতা।

এখানে আসার পর থেকে ডমিনিক তিনবার ওই সাজাঘরের অতিথি হয়েছে। প্রতিবারের অভিজ্ঞতা আগের বারের চেয়ে জঘন্য। প্রথম সে এই ঘরে এসেছিল ভরতি হবার ঠিক পরেই। দুজন ইউনিফর্ম পরা মুশকো জোয়ান মাথায় কাপড় ঢেকে তাকে প্রায় বাস থেকেই টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেছিল ওয়েটিং রুমে। তালা মেরে রেখেছিল ভীত আর হতবাক ডমিনিককে। সেই ওয়েটিং রুমে কোনও জানালা নেই, আসবাব নেই, মেঝে ধূসর কংক্রিটে বাঁধানো, ঠান্ডা। চারিদিকে তীব্র ঝাঁঝালো অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ। ডমিনিক পরে বুঝেছে, ওটা আসলে আতঙ্কের ঘ্রাণ। ওয়েটিং রুমের একটা দেওয়ালে আগাপাশতলা গাদাগাদি করা ফোটো লাগানো। এক ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নেই।

সেইসব মানুষদের ছবি, যাদের এখানে অত্যাচার করা হয়েছে।

হাজার হাজার ফোটো। হাজার হাজার মুখ। প্রতিটা মুখ ভয়ে বিবর্ণ।

ওরা এসে সেই দেওয়ালে ডমিনিকের একটা ছবি সেঁটে দিল। বেশ কয়েকমাস আগে তোলা, কিন্তু এত বেদনার মধ্যেও তাকে কত কমবয়সি লাগছে।

ওকে নিয়ে প্রথমেই একটা কাঠের তাকে বেঁধে ফেলা হল। প্রথম দিনই বুঝিয়ে দেওয়া যে এখানে থাকতে হলে কেমনভাবে চলতে হবে। ও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছিল,

যতক্ষণ না গলা ফেটে ফ্যাসফ্যাসে হয়ে যায়, তারপর গলার আওয়াজ বুজে গেছিল নিজে থেকেই।

ডমিনিকের সহযোগীরও এখন সেই অবস্থা। তীব্র চিৎকার এখন চাপা গোঙানিতে পরিণত হয়েছে। এমন না যে ব্যথা কমেছে, আসলে এক ঘণ্টা ওই সাজাঘরে থাকলে কারও আর চিৎকারের ক্ষমতা থাকে না। বেচারা...

ডমিনিক চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আচমকা তার চোখ পড়ল নিজের ফোটোতেই। এই ছবিটা সেবার তোলা, যেবার তাকে দ্বিতীয়বার এই সাজাঘরে নিয়ে আসা হয়। ইন্সট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলার কোনও রীতি নেই এখানে, যা বলার তিনিই বলেন। কিন্তু ডমিনিকের মনে নেই তিনি কী বলেছিলেন।

এই ছবিতে ডমিনিকের চোখে জল। মুখটা করুণ।

ওরা সেবার স্ক্রু ব্যবহার করেছিল। ওর হাতের বুড়ো আঙুলে। ওর হাঁটুতে। ওর অণ্ডকোষে।

সেরে উঠতে দশদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল ওকে।

তৃতীয়বার সাজাঘরের অভিজ্ঞতা জঘন্যতম। সেবার তিনখানা পোলারয়েড ছবি তোলা হয়েছিল ওর। প্রতিটাতেই ও দেওয়ালে ঝুলছে। টানা দুই ঘণ্টা ধরে ঝুলিয়ে রেখে রাবারের চাবুক দিয়ে ওর দেহের প্রতিটা ইঞ্চিতে সপাসপ চাবকানো হয়েছিল।

তারপর আবার।

আর আবার।

আবার।

সেবার ব্যথা এতটাই তীব্র যে ও ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। রীতিমতো একজন ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল, যিনি অ্যাম্ফিট্যামিন ইঞ্জেকশন দিয়ে ক্রমাগত ওকে সজাগ রাখছিলেন। যে লোকটা অত্যাচার করে, এটাই তার আনন্দ। অত্যাচার ভোগ না করতে পারলে আর কী হল? ডমিনিক শুনেছে একবার এক বেচারি মেয়েকে টানা চোদ্দো ঘণ্টা এই ঘরে রেখে দিয়েছিল। একটাই কারণ। মেয়েটা খানিক বাদে বাদেই জ্ঞান হারাচ্ছিল।

নির্যাতক লোকটি এর ওপরেই বেঁচে আছে। ও এসব ভালোবাসে। ভালোবাসে হাড়গোড় ভেঙে দিতে। যখন কেউ ওর ওপর রাগ বা ঘৃণা দেখায়, ওর মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে ওঠে। শুধু ওর কাছে নত না হলেই হল। তাহলে দেহের সঙ্গে সঙ্গে ও মানুষটার আত্মাটাকেও ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে দেবার সুযোগ পায়।

ভগবান জানে, এই লোকটাকে এরা কোথা থেকে খুঁজে নিয়ে এসেছে...

আবার একটা ফ্যাসফ্যাসে আর্তনাদ। এক্ষুনি এর পালা শেষ হবে।

এবার ডমিনিকের পালা।

এটা ওর চার নম্বর বার, মানে এবার বিদ্যুৎ। অন্যদের থেকে যা শুনেছে, তাতে বুঝেছে বিদ্যুৎ দিয়ে শাস্তির কাছে অন্য শাস্তিগুলো নেহাতই পানসে। ওর দাঁত, কান, পায়ুছিদ্র দিয়ে কারেন্টের শক দেওয়া হবে। সরকার এখনও এই শাস্তিকে ব্যান করেননি, যদিও এই শাস্তিতে জায়গায় জায়গায় কালো পোড়া দাগ থেকে যায়। পোড়া দাগ নাকি স্থায়ী ক্ষতির মধ্যে পড়ে না।

চিৎকার একেবারে বন্ধ হয়েছে। ওয়েটিং রুমের একেবারে পিন পড়া নিস্তব্ধতায় ডমিনিকের একটা ঝিম ধরা ভাব এল।

আর মাত্র কিছুক্ষণ।

ডমিনিক নিজের হাঁটু দুটো মুড়ে বুকের সামনে নিয়ে এল। এই নিয়ে প্রায় একশো বার সে নিজের বাঁ পায়ের গোড়ালিতে হাত বুলিয়েছে। নিয়মমতো তাকে পুরো উলঙ্গ করে নিয়ে আসার কথা, কিন্তু কায়দা করে একটা টেপ দিয়ে সে গোড়ালির তলায় একটা ছোটো পেনসিল আটকে এনেছে। পেনসিলের ধারালো ডগাতে টেপ আটকানো। এই অস্ত্রে আদৌ কোনও কাজ হবে কি না, কিংবা ও এটা ব্যবহার করতে পারবে কি না, ওর বেশ সন্দেহ আছে। হয়তো ওই অত্যাচারী লোকটা ওর এই চেষ্টা দেখে মুচকি হাসবে। মজা পাবে।

আর মজার পরেই আসবে রাগ।

যদিও ও আগে থেকে এটা ভেবেই রেখেছিল, তবু ডমিনিকের মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

এটা কাজ করতেও পারে, যদি ও একটু ক্ষিপ্র হয়। যদি ও ওই অত্যাচারী মানুষটার মুখে আঘাত করতে পারে, অথবা কোনও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে... হয়তো...

দরজা খুলে গেল।

দরজা জুড়ে ওই অত্যাচারী লোকটা দাঁড়িয়ে। সারা দেহে ঘাম আর ভয়ের তীব্র গন্ধ। লম্বায় ডমিনিকের চেয়ে প্রায় ফুট দেড়েক লম্বা। অসুরের মতো চেহারা, চওড়া বুক, শক্ত, মোটা মোটা আঙুল।

"আপনাকে আবার দেখে ভালো লাগল, মি. প্যাটাগ্লিয়া", খসখসে আওয়াজে বলল লোকটা। কালো আলখাল্লা থেকে শুধু মুখটাই দেখা যাচ্ছে, আর সেই মুখে কালো কালো বিকৃত দাঁতের সারি। লোকটা হাসছে। লোকটার হাতে, বগলে রক্তের ছিটে, কালো প্যান্টের সামনে অনেকটা জায়গা ভিজে রয়েছে এখনও।

যৌন নির্যাতন বা ধর্ষণের অনুমতি সরকার দেয়নি, কিন্তু অত্যাচার করার সময় লোকটা স্বমেহন করতেই পারে, তাতে নিয়মমাফিক কোনও বাধা নেই।

ডমিনিক হাতের তেলোতে পেনসিলটা লুকিয়ে ফেলল আর পায়ুছিদ্র চেপে বন্ধ করে নিল। ওর দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। অত্যাচারী মানুষটা একটা ক্লিপবোর্ড হাতে নিয়ে ইঁদুরের মতো ছোটো ছোটো চোখে কী সব দেখতে লাগল।

"হল মনিটরকে আক্রমণ করেছিলেন, তাই তো ডমিনিক? আপনার দেখি খুব সাহস! বিচি দুটো আস্ত আছে তো? নাকি খুলে নিয়ে জেনারেটরে লাগিয়ে দেখব আলো জ্বালানো যায় কি না"... নিজের বদ রসিকতায় নিজেই বাচ্চা মেয়েদের মতো খিলখিল করে হেসে উঠল লোকটা।

ডমিনিক প্রায় অসাড় পায়ে ঘরের একদিকের দেওয়ালে সেঁটে যেতে থাকল। ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে। অত্যাচারী লোকটা এগিয়ে এল, ঝুঁকে পড়ে ডমিনিকের কবজি ধরল মুঠিতে।

"প্লিজ", ডমিনিক প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। তালুর পেনসিলটা সরু, নির্জীব একটা স্প্যাগেটির টুকরোর মতো মনে হল তার।

অত্যাচারী লোকটা নিজের মুখ ডমিনিকের খুব কাছে নিয়ে এল। ডমিনিক ওর মুখের দুর্গন্ধ টের পাচ্ছিল।

"আজকে আপনিই আমার শেষ বরাত। আমাদের হাতে প্রচুর সময়..."

ডমিনিক এক ঝলকে দেওয়ালে নিজের ফটোর দিকে তাকাল।

"না, সময় বেশি নেই।"

ডমিনিকের গলা শুনে লোকটা চমকে গেল। চাপা, ফিসফিসে, কিন্তু ইস্পাতের মতো স্থির, সংকল্পে স্থিত।

অত্যাচারী লোকটা হাসি হাসি মুখে চোখ পাকাল। তবে বোঝা গেল ও অবাক হয়েছে।

"আরে! মি.প্যাটাগ্লিয়া... আপনি আমার মুখে মুখে তর্ক..."

ডমিনিকের হাত বিদ্যুৎগতিতে পেনসিলের ধারালো অংশটা ঢুকিয়ে দিল লোকটার ডান চোখে।

একটা অদ্ভুত সপসপে আওয়াজ করে পেনসিলটা ভিতরে ঢুকে গেল।

লোকটা চিৎকার করে উঠল। ডমিনিকের হাত ছেড়ে দিয়ে এবার সে পিছোতে লাগল এক পা, এক পা করে। তার মাংসল হাত দুটো মুখের ওপর নড়াচড়া করতে লাগল, যেন দুটো পাখি মাটিতে নামতে ভয় পাচ্ছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে নেমে এল রক্ত আর কালচে চটচটে তরল।

ডমিনিক দ্রুত তিন পা এগিয়ে এসে লোকটার ডান চোখে মারল এক ঘুসি, যাতে পেনসিলটা একেবারে গোড়া অবধি ঢুকে গেল চোখের গহ্বরে।

অত্যাচারী লোকটা একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল, আর তারপর একটা মোটা আলুর বস্তার মতো লুটিয়ে পড়ল ঠান্ডা কংক্রিটের মেঝেতে। তার মুখ হাঁ করা, অন্য চোখটা ঠিকরে বেরুচ্ছে, সে চোখের সাদা অংশও এখন টকটকে লাল।

ডমিনিক ওর দেহের পাশে খানিক দাঁড়াল। ও কি সত্যিই পারল? পারল লোকটাকে মেরে ফেলতে?

পালাও! মাথার ভিতরে কে যেন বলে উঠল।

কিন্তু ডমিনিকের পা যেন মেঝেতে শিকড় গেঁথে আটকানো।

ওকে নিশ্চিত হতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যে বেজন্মাটা মরেছে।

অ্যাড্রিনালিনের ক্ষরণ ধীরে ধীরে কমছিল। ডমিনিক ভয়ে কাঁপতে লাগল। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাতেই হাঁটু মুড়ে বসে লোকটার পালস খুঁজে বার করবার চেষ্টা করল।

এ যেন জেনেশুনে আগুনে হাত দেওয়া। যেন অসীম সময়কাল ধরে খুব সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে ডমিনিক লোকটার ভিজে, আঠালো ঘাড়টা স্পর্শ করল। ঘাড়ের মাংসল থাকগুলোর মধ্যে ডমিনিক চেষ্টা চালাল ক্যারোটিড ধমনিটা খুঁজে পাবার।

পালস আছে।

যেন কারেন্টের শক খেয়েছে, এমনভাবে ডমিনিক হাতটা সরিয়ে নিল।

"পালা! হতচ্ছাড়া পালা! যদি ও একবার জেগে ওঠে..."

কিন্তু ডমিনিক পালাতে পারছে না। ও যেন অনন্তকাল এই মেঝের সঙ্গে বাঁধা। ও এই মানুষটাকে বাঁচতে দিতে পারে না। শুধু নিজের জন্য না, সবার জন্য।

ডমিনিক নিচের ঠোঁট কামড়াল। আবার হাত বাড়াল পেনসিলটার জন্য।

লোকটা কাতরে উঠল একবার।

ডমিনিক লাফিয়ে উঠল। ওর একটা অস্ত্র দরকার। কিছু একটা হলেই হবে। ও ওয়েটিং রুমের দরজা খুলে সোজা ছুট লাগাল। বাঁদিকে একটা উঠোন আর ডানদিকে সাজাঘর।

অদ্ভুত একটা দোলাচল শুরু হল ডমিনিকের মধ্যে। ওর আত্মার এক অংশ সাজাঘরে যেতে চাইছিল না, কিন্তু ওখানেই তো অস্ত্রগুলো...

ও ডানদিকে পা বাড়াল।

দরজা খুলেই যেন এক দুঃস্বপ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে সাজাঘর। অন্ধকার, নোংরা, চটচটে, দুটো হলুদ বালব তেলতেলে তারে ঝোলানো। দেওয়ালের রং কালো। গোটা ঘর জুড়ে পেচ্ছাপ আর পায়খানার বোঁটকা গন্ধ যেন স্থির হয়ে আছে। মেঝেতে শিকল আর আংটা বাঁধা। দেওয়ালের র‍্যাক ভরা সেই অত্যাচারী মানুষটার অত্যাচার করার যন্ত্রপাতি, যেন হাঁ করে রয়েছে তাদের পরের শিকারের জন্য।

ডমিনিক গাছের পাতায় হাওয়া বয়ে যাবার মতো একটা শব্দ শুনতে পেল। পিছন ফিরে দেখল দরজায় সেই অত্যাচারী মানুষটা। সোঁ সোঁ করে নিশ্বাস ফেলছে। তার চোখ থেকে তখনও পেনসিলটা বেরিয়ে রয়েছে আর তা থেকে লালচে চটচটে তরল গলে গলে পড়েছে। সে তার মোটা তর্জনী তুলে ধরল ডমিনিকের দিকে, তারপর থপ করে আরও এক পা এগিয়ে এল।

ডমিনিক লোকটার ক্যাবিনেটের দিকে পা বাড়িয়ে হাতে একটা লাইটার জ্বালানোর অ্যালকোহলের পাত্র নিল। পাত্রের মাথার ঢাকনা খুলে ছিটিয়ে দিল লোকটার মুখ, নাকে চোখে।

চোখের আহত জায়গায় কোহল লেগে জ্বালা বেড়ে উঠল বহু গুণ। লোকটা এক পা পিছনে ফিরতেই জেনারেটারে হোঁচট খেল।

"বেজম্মার বাচ্চা... তোকে একবার হাতে পাই..."

ডমিনিক হাত বাড়িয়ে পরের অস্ত্রটা পেল। একটা ডিজিট্যাল ক্যামেরা... সেটা হাতে নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপরে। একের পর এক বাড়ি মেরে চলল লোকটার মুখে, যতক্ষণ না ক্যামেরার প্লাস্টিকের দেহ ফেটে গিয়ে চলটা উঠতে থাকে। ও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল প্রতিটা বাড়িতে লোকটার হাড়গুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

লোকটা তাও লাফিয়ে উঠল। ডমিনিক উলটে পড়ে গেল, মাথার পিছন ঠুকে গেল মেঝেতে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। মনে হল তার বাঁ কাঁধে কী যেন ফুটছে।

তার ঠিক পাশেই অত্যাচারী লোকটা উঠে বসল। পেনসিলটা ধরে টেনে বার করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে উপড়ে এল ওর চোখটাও, সব নার্ভ সমেত। মনে হল যেন একটা লাল জেলিফিশ তার কর্ষিকাগুলোকে নাড়াচ্ছে। লোকটা তীব্র চিৎকার করে উঠল। পেনসিলটা ফেলে দিল মাটিতে। উপড়ানো চোখটা গালের সামনে ঝুলছে।

ডমিনিক পিছনে হাত দিয়ে বুঝল কী ঠেকছে তার পিছনে। টেনে সামনে নিয়ে এল সেটাকে।

একটা ইস্পাতের ক্লাম্প, প্রায় তার হাতের সমান। সে একদিক চেপে ধরতেই সামনেটা হাঁ হয়ে গেল। সেই হাঁয়ের ভিতর ছোটো ছোটো ইস্পাতের দাঁত। ক্লাম্পের নিচে একটা তার বাঁধা। ডমিনিক দেখতে পেল সেই তারের অন্য প্রান্তের প্লাগ গোঁজা রয়েছে এক ইলেকট্রিক জেনারেটারের সঙ্গে।

লোকটা ততক্ষণে হাতে রবারের চাবুকটা নিয়ে নিয়েছে। চাবুকের এক ঝটকায় সেটা লাগল গিয়ে ডমিনিকের মুখে। তীব্র ব্যথায় কাতরে উঠল ডমিনিক। সে হাতে ক্ল্যাম্প নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। লোকটা সপাসপ করে চাবুকের বাড়ি মেরেই চলেছে।

"তুই জানিস ব্যথা কাকে বলে? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি", গর্জে উঠল লোকটা।

ডমিনিক শোয়া অবস্থাতেই ঘুরে গেল। আরও একটা চাবুকের বাড়ি পড়ল তার মুখে। সে তার মধ্যেই ক্ল্যাম্পটা আটকে দিল অত্যাচারীটার গোড়ালিতে। আর...

কোনওমতে হাত বাড়িয়ে অন করে দিল জেনারেটারের সুইচ।

এক ঝটকায় লোকটা গুটিয়ে গেল, যেন কোনও বইয়ের মলাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই দমাস করে মেঝেতে ঠুকে গেল মাথাটা। ওর গোটা দেহের চারদিকে ওজোন গ্যাসের এক সুতীব্র ঝড় যেন বয়ে গেল এক নিমেষে। মুখ থেকে ছিটকে ছিটকে বেরোতে লাগল রক্তের ধারা। দাঁতের মাঝে চেপে ধরা জিভের টুকরো আর চাপ সহ্য করতে না পেয়ে কেটে গড়িয়ে পড়ল চিবুক বেয়ে।

ডমিনিক কাঁকড়ার মতো ধীর পায়ে পিছিয়ে পিছিয়ে দূরত্ব বাড়াল। সে বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে দেখল সেই ক্লাম্প থেকে গোড়ালি বরাবর ধোঁয়া উঠছে আর সেই ধোঁয়ার সঙ্গে আগুন, চামড়া পোড়ার গন্ধ। আগুন ছুঁয়ে ফেলল দেহে ছড়ানো দাহ্য অ্যালকোহলকে।

পাটকাঠির মতো দপ করে জ্বলে উঠল গোটা লোকটা।

ডমিনিক অন্যদিকে তাকিয়ে এক ড্রয়ারে তার জামাকাপড় রাখা দেখতে পেল। পিছন থেকে আসা পোড়া মাংস ফাটার ফটাস ফটাস আওয়াজ আর মরতে থাকা লোকটার গোঁ গোঁ ধ্বনিকে উপেক্ষাই করল ডমিনিক। যখন সে জুতোর ফিতে বাঁধছে, ততক্ষণে শয়তানটার সঙ্গে ওর আওয়াজও মরে গেছে।

পাশেই আর-এক টিন কোহল আর একটা তার কাটার প্লায়ার ছিল। সেটাকে ডমিনিক পিছনের পকেটে গুঁজে নিল। তারপর গোটা র‍্যাকে ছড়িয়ে দিল তরল কোহল। অত্যাচারী লোকটার সাধের অস্ত্রের ক্যাবিনেটেও...

দারুণ পুড়ল জিনিসগুলো।

শেষ অবধি ও গেল ওয়েটিং রুমে। জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবার আগে ও খুব মন দিয়ে নিজের ছবিটাকে দেখে চলল।

ও জানে। ওরা আসবে। ওকে পালাতেই হবে।

উঠোনের দিকের দরজাটা খোলা, আর অবাক কাণ্ড, কোনও প্রহরী নেই। ঠিকই আছে। হল মনিটর জানে ডমিনিক এখন বেশ কয়েক ঘণ্টা সাজাঘরে কাটাবে, তাই এদিক ওদিক গেছে বোধহয়।

ডমিনিক খোলা উঠোনে এসে দাঁড়াল। গাছের পাতার ফাঁকে সূর্যের কিরণ তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে পুরোনো বন্ধুর মতো। ঠান্ডা উদাসী হাওয়া তার নাকের থেকে পেচ্ছাপের দুর্গন্ধ দূর

করে দিল এক নিমেষে।

বাস্কেটবল কোর্টের পরের তারের জাল। তার ওপরে কাঁটাতার। টপকানো অসম্ভব।

কিন্তু ও টপকাবে না।

দুই মিনিটের মধ্যে তার কেটে ও বাইরে বেরিয়ে এল।

স্বাধীনতা মায়ের ভালোবাসার মতো জড়িয়ে ধরল তাকে।

ও বনপথ দিয়ে দৌড়াতে থাকল। ও জানে ওকে একদিন আবার এখানেই ফিরতে হবে।

কিন্তু শিকার হিসেবে না। জীবন্ত বলি হিসেবে না।

ডমিনিক ব্যান হয়ে যাওয়া ইতিহাস বইগুলো পড়েছে। ও জানে কয়েকশো বছর আগে আমেরিকার স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের বিন্দুমাত্র অত্যাচার করা হত না। তখন তার মতো এগারো বছর বয়সের ছোকরারা স্কুলে শুধুই পড়তে যেত। শিক্ষা মানে সরকারের হুকুম তামিল ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা ছাত্ররা তখন স্বাধীন ছিল।

এই অত্যাচারী লোকটা বড়ো একটা রোগের একটা উপসর্গ মাত্র। ও সিস্টেমেরই অংশ। সিস্টেমেরই ফসল।

ডমিনিক জানে, তার মতো আরও ছাত্র আছে। তারাও যোদ্ধা, তারাও রুখে দাঁড়াচ্ছে। তারাও পরিবর্তন চায়।

ও তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। ও তাদের দলে যোগ দেবে। শক্তিশালী হবে। তারপর আবার যখন এখানে ফিরে আসবে ও, শিকার হিসেবে আসবে না।

আসবে মুক্তিদাতা হিসেবে।

ডমিনিক প্যাটাগ্লিয়া একবারও পিছন ফিরে তাদের প্রাথমিক ক্যাম্পের দিকে না তাকিয়ে বনপথ দিয়ে দৌড়াচ্ছিল। ও জানে আজ ও কী করেছে আর ও যেন শুনতে পেল হাজার হাজার কচি ছাত্রছাত্রী ওর নামেই জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

অনুবাদকের জবানি : এককালের বিখ্যাত (বা কুখ্যাত) ই.সি কমিকসের হরর স্টোরির ধাঁচে লেখা জোসেফ অ্যান্ড্রু কনরাথের *'Punishment Room'* ডিসটোপিয়ান সমাজের এক অদ্ভুত গাথা। শুরুতে চলনটা ভয়াল হলেও সেই আক্ষরিক ভয় আমাদের একেবারে কাঁপিয়ে দেয় শেষ কয়েকটা অনুচ্ছেদে। আমরা চমকে উঠি। এ কোন পৃথিবীর কথা! শুধু হরর না হয়ে শেষের এই চরম মানবিক ট্যুইস্ট গল্পকে নতুন এক স্তরে উত্তীর্ণ করেছে।

পরিশিষ্ট

অন্ধকারের উৎস সন্ধানে

"There are different kinds of darkness... There is the darkness that frightens, the darkness that soothes, the darkness that is restful... the darkness of lovers, and the darkness of assassins. It becomes what the bearer wishes it to be, needs it to be. It is not wholly bad or good."

— Sara J. Maas

আঁধারের সঙ্গে মানুষের নাড়ির যোগ একেবারে শুরুর দিন থেকেই। গর্ভস্থ ভ্রূণ মাতৃজঠরে নয় মাস দশ দিন কাটায়, অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে নিমজ্জিত অবস্থায়। সংকীর্ণ পরিসরে, জমাট বাঁধা অন্ধকারে কাটানো সেই সময়কাল গভীরভাবে ছাপ ফেলে তার সদ্যগঠিত মস্তিষ্কে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও সেই স্মৃতি ভোলে না সে, প্রায় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতোই অন্ধকারকে এড়িয়ে চলতে চায়। তবে এই মনোভাব বেশিদিন স্থায়ী হয় না। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সঙ্গে তার সম্পর্কের সমীকরণেও আসে পরিবর্তন। আগের তীব্র বিকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয় নিষিদ্ধ আকর্ষণ, বিতৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত হয় অদম্য কৌতূহল। পরস্পরবিরোধী এই মানসিকতা শুধু তার চেতন-অবচেতনে নয়, প্রভাব ফ্যালে তার পছন্দ-অপছন্দে, তার শিল্প-সাহিত্যের উপলব্ধিতে, এমনকি তার প্রাত্যহিক জীবনেও। রাতে ঘরের আলো নিভিয়ে ভূতের বই পড়া, অথবা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ভয়ের সিনেমা দেখার প্রবৃত্তি এভাবেই জাগে তার মনে। যৌবনে পৌঁছে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় হিংসা-হানাহানির খবরকে আর অগ্রাহ্য করে না সে, টিভিতে ইরাক-এর যুদ্ধের সরাসরি সম্প্রসারণ নজরে পড়লে রিমোট ঘুরিয়ে চ্যানেল বদলে দেয় না। এভাবেই দিন কাটে, রাত কাটে, এবং জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত প্রশ্ন তার আত্মসমীক্ষার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়—"তিমির হননে তবু অগ্রসর হয়ে/ আমরা কি তিমিরবিলাসী?"

'আঁধারের আখ্যান'। নামটা দেখে অবাক হলেন কি? বিশ্বাস করুন আমিও হতাম, যদি না এই বইয়ের বেশ কিছু গল্প আমার আগে থেকেই পড়া থাকত (গল্পগুলো গত কয়েক বছরে আমার দ্বারা সম্পাদিত একাধিক সংকলনে সংকলিত হয়েছে)। সেই পূর্বঅভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি, অন্ধকারের উপস্থিতি এই সংকলনের প্রতিটা গল্পে রয়েছে। কখনও সামনাসামনি, কখনও আড়াল থেকে, কখনও ভয়াল ভয়ংকর আকৃতি নিয়ে, কখনও আবার রূপকের রূপ ধরে, কখনও উন্মত্ত সমুদ্রের মতো সদর্পে, কখনও আবার অন্তঃসলিলা নদীর মতো নিস্তব্ধে। কিন্তু সে রয়েছে, এবং তার 'ফ্লেভার' আপনারাও অনুভব করতে পারবেন : বইটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখার সময়, বইয়ের পাতায় পাতায়, প্রতিটা কাহিনির পরতে পরতে।

এই বইয়ের পনেরোটি কাহিনি প্রকারভেদে দুরকম : মৌলিক এবং অনুবাদ। আবার জঁর বা ঘরানা অনুযায়ী এই গল্পগুলোকে মোটামুটিভাবে চারটে শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : ক্রাইম/ডিটেকশন, অলৌকিক/হরর, সায়েন্স ফিকশন/ফ্যান্টাসি এবং রহস্য/রোমাঞ্চ। তবে গল্পগুলো নিয়ে সামগ্রিক আলোচনায় মৌলিক/অনুবাদ ভাগাভাগি অথবা জঁর-কেন্দ্রিক ভেদাভেদের কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাইনি, কারণ আমার মতে কোনও গল্পের মৌলিকত্ব

অথবা জঁর-ভিত্তিক পরিচয় তার অভিঘাতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। সাহিত্যের ক্যানভাসে মৌলিক সৃষ্টির ফুল ফোটানো পরিশ্রমসাধ্য এবং সৃজনশীল এক প্রয়াস, অন্যদিকে রোয়াল ডাল, নিল গেইম্যান বা লরেন্স ব্লক-এর মতো প্রখ্যাত লেখকদের গল্প বাংলায় অনুবাদ করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতেও যথেষ্ট পরিমাণ কবজির জোর লাগে। এই সংকলনে লেখক দুটোই সাবলীলভাবে করে দেখিয়েছেন, তাই তাঁর প্রচেষ্টাকে প্রাপ্য সম্মান দিতে শুরু থেকে শেষ অবধি গল্প ধরে ধরে বিশ্লেষণ করেছি আমি, যেখানে যেমন প্রয়োজন প্রাসঙ্গিক তথ্য সহকারে। আশা রাখি আলোচনার এই ধরন আপনাদের মন্দ লাগবে না।

আসুন তাহলে, আর দেরি না করে আলো ফেলা যাক এই সংকলনের অন্তর্গত আঁধারময় গল্পগুলোর ওপর—

'আঁধার আখ্যান' বইয়ের প্রথম গল্প 'নির্জন স্বাক্ষর' এক নিখাদ ডিটেকটিভ ফিকশন, যা কিনা সাবজঁর অর্থাৎ উপধারার দিক দিয়ে 'লকড রুম মিস্ট্রি'-ও বটে। এডগার অ্যালেন পো-র 'দ্য মার্ডারস ইন দ্য রু্য মর্গ' কাহিনিতে যার আত্মপ্রকাশ, আগাথা ক্রিস্টি থেকে জন ডিকশন কার-এর মতো কিংবদন্তি সাহিত্যিকগণ যাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন অথচ বাংলা ক্রাইম-ডিটেকশনে যা আজও ব্রাত্য, সেই মোটিফ-কে এই গল্পে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন লেখক। বন্ধ লিফটের ভেতর ঘটে যাওয়া খুনের রহস্য উদ্ঘাটনের আগে অবধি পাঠককে ধাঁধায় রাখা এই কাহিনির আর-এক বৈশিষ্ট্য হল গোয়েন্দা তুর্বসু-র প্রথম আবির্ভাব, যা একে 'সূর্যতামসী' উপন্যাসের প্রিকোয়েল হিসেবে আমাদের সামনে আনে।

নন-ক্রাইম স্টোরির প্রতি লেখকের যে দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে সেটা তাঁর পরবর্তী দুটো গল্পে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই ধরনের গল্পগুলোতে সরাসরি কোনও ক্রাইম সংঘটিত হয় না, কিন্তু অতীতে ঘটে যাওয়া ক্রাইমের বিবরণ অথবা ভবিষ্যতে ঘটতে চলা অপরাধের বীজ লুকিয়ে থাকে। সেই চিহ্ন অথবা সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে পারলেই জিতে যায় পাঠক, সে কারণেই হয়তো যতবার 'স্ন্যাপচ্যাট' ও 'কাঁটা' পড়ি, ততবারই (অন্ধকার গল্প হওয়া সত্ত্বেও) একচিলতে হাসি আমার ঠোঁটে খেলে যায়। 'স্ন্যাপচ্যাট' এক আদর্শ 'কোল্ড কেস', যেখানে বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া এক অপরাধ হঠাৎ করে চিঠির বয়ানের মাধ্যমে সামনে আসে এবং পাঠককে চমকে দেয়। অন্যদিকে 'কাঁটা' গল্পে প্রত্যক্ষ খুনের বদলে আসন্ন খুনের ইঙ্গিত এবং অনেকখানি মনস্তাত্ত্বিক ট্রিটমেন্ট আমাদের অভিভূত করে। আগাথা ক্রিস্টি-র স্ট্যান্ডঅ্যালোন কিছু ছোটোগল্প মনে পড়িয়ে দেওয়া এই দুটো কাহিনি, পাঠক, আপনাদের ভালো লাগতে বাধ্য।

'পোস্টকার্ড' নিঃসন্দেহে এক রহস্যময় গল্প; পাল্প যুগের অপরাধ গল্পের প্রায় সব 'ট্রোপ'-ই এখানে স্বমহিমায় উপস্থিত। এখানে বন্ধ ঘরের মধ্যে মৃত্যুর ঘটনা পাবেন, যা 'ইম্পসিবল ক্রাইম'-এর প্রতি ইঙ্গিত করে। জন কোলিয়ার-এর 'লিটল মেমেন্টো' গল্পের বৃদ্ধের মতো একজন চরিত্র পাবেন, যে অন্যের সর্বনাশ করেই মানসিক আনন্দ পায়। এ ছাড়াও পাবেন ষড়যন্ত্রের জাল, লোভের চক্রব্যূহ, আপনাদের ধাঁধায় ফেলার জন্য 'রেড হেরিং'-এর অবতারণা। আর এসবের পরেও যদি আপনার কিছু চাওয়ার থাকে, পাঠক, সেই চাহিদাও পূরণ করবে 'পোস্টকার্ড'— নৈতিক ঠিক-ভুলের সীমারেখা মুছে দিয়ে ধূসর আঁধারের সামনে দাঁড় করাবে আপনাদের।

ফ্যান্টাসি মানেই সোনালি সকাল, গোলাপি বিকেল নয়, পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়া রাজপুত্র বা রাজকন্যা নয়। ফ্যান্টাসি গল্পও আঁধারের দ্যোতনা জাগানোর, মানবমনের

অন্ধকারকে কল্পনার আয়নায় বহু গুণ বিবর্ধিত করার ক্ষমতা রাখে। 'টেলিপ্যাথি' এমনই এক কাহিনি, যেখানে মানবমনের এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দিকনির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। 'ক্যাট অ্যান্ড মাউস' লুকোচুরির মধ্য দিয়ে এগোয় কাহিনি, প্রতিমুহূর্তে 'কী হয় কী হয়' সাসপেন্সের দ্যোতনা জাগায়। শেষ পর্যন্ত দমবন্ধ-করা ক্লাইম্যাক্সের মধ্য দিয়ে ক্রাইসিসের সমাধান হয় এবং পাঠক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। নম্বর দেওয়ার সুযোগ থাকলে এই গল্পকে পাঠক লেটার মার্কস দিতেন, এমনটা আমার অনুমান।

সাইকোলজিক্যাল হরর-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'পিপহোল', ওপেন এন্ডিংয়েরও। বেশ কয়েক বছর আগে কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত এই গল্পের ইউএসপি হল এর শেষ লাইন, যা পাঠকের রক্ত জল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আদর্শ ছোটোগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যে কথা বলেছিলেন, 'শেষ হয়ে হইল না শেষ', এই গল্প যেন তাকেই নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করে। চাবির গর্ত দিয়ে উঁকি দেওয়া সবুজ চোখ আসলে মানবীর, না দানবীর, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও জটিল রহস্য রয়েছে, আমরা কখনোই স্পষ্টভাবে জানতে পারি না, আন্দাজ করতে পারি মাত্র। পাঠককে এই আন্দাজ করার স্বাধীনতা সব কাহিনি দেয় না; এখানেই 'পিপহোল'-এর মাহাত্ম্য, স্পেকুলেটিভ ফিকশন হিসেবে সার্থকতা।

'শল্লের নাভি' গায়ে কাঁটা দেওয়া এক অলৌকিক গল্প, যার সম্বন্ধে ইংরেজি শব্দবন্ধ ধার করে বলাই যায়— 'ব্যাক টু দ্য বেসিকস'। সাবেকি গন্ধমাখা, হেমেন রায়কে মনে পড়িয়ে দেওয়া এই গল্পের সূত্রপাত হয় কথকের অতীতের স্মৃতিচারণা দিয়ে। তারপর ধাপে ধাপে চড়ে ভয়, বিস্ময়, রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার পারদ। কলমের জোর থাকলে বহুব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া তন্ত্রনির্ভর হরর-এর প্রয়োগেও উৎকৃষ্ট ভয়ের গল্প লেখা যায়, লেখক এখানে সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে 'কনভেনশনাল' ভয়ের গল্প কেমনভাবে লেখা উচিত, এই কাহিনি তারই পথনির্দেশক।

বাংলা হরর সাহিত্যে মিথমেকিংয়ের কাজ বর্তমান সময়ে অনীশ দেব, সৈকত মুখোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য প্রমুখ হাতে গোনা কয়েকজন সাহিত্যিক ছাড়া আর কেউ করেছেন কি না (অথবা করার কথা ভেবেছেন কি না) সন্দেহ। লেখক কৌশিক মজুমদার সেই কঠিন চ্যালেঞ্জটাই নিয়েছেন তাঁর 'অভিশাপ' গল্পে, এবং সফল হয়েছেন। সচেতনভাবেই নাগরিক জীবনের চাকচিক্য, অত্যাধুনিকতার আস্ফালন এবং জ্ঞানের অহংকারের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন তিনি, গ্রামবাংলার অলিতে গলিতে যে 'অভিশাপ'এর আতঙ্কে মানুষ সিঁটিয়ে যায়, তেমনই এক উপকথার জীব 'দানো'-কে গল্পে এনে হাজির করেছেন পাঠকের সামনে, এবং স্রেফ বিবরণকে হাতিয়ার করে পাঠকের শিরদাঁড়া দিয়ে আতঙ্কের শীতল স্রোত বইয়ে দিয়েছেন।

'মরণের পরে' এক দুর্দান্ত 'শর্ট-শর্ট' গল্প, যা হয়তো সেই অর্থে ভয় পাওয়ায় না, কিন্তু বিস্ময়ে স্তব্ধবাক অবশ্যই করে। অ্যামব্রোস বিয়ার্স-এর 'ওয়ান সামার নাইট' থেকে এই গল্পের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন লেখক, কিন্তু আবহরচনা থেকে চরিত্রায়ন সবেতেই ষোলো আনা বাঙালিয়ানা বজায় রেখেছেন। বিয়ার্স-এর অধিকাংশ ছোটোগল্পেরই 'স্যালিয়েন্ট ফিচার' হল 'সার্ডনিসিজম', অর্থাৎ সূক্ষ্ম 'ব্ল্যাক হিউমার'। পাশ্চাত্য আমেরিকান সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য এই উপাদান আমরা আলোচ্য কাহিনিতেও পুরোমাত্রায় পাই; একইসঙ্গে পাই 'প্রিম্যাচিওর বেরিয়াল' থিমের আভাস, যা গল্প শেষে পাঠককে একবারের জন্য হলেও অস্বস্তিতে ফেলবে।

‘প্রেতিনী’-কে এই সংকলনের সবচেয়ে হাড় হিম করা গল্প বললে অত্যুক্তি হবে না। রবার্ট ফ্রস্ট তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন— ‘I have it in me so much nearer home/ To scare myself with my own desert places.’ ভূতপ্রেত, রাক্ষস খোক্কস, ভ্যাম্পায়ার বা ওয়্যারউলফ নয়, মানবমনের গহিনে লুকিয়ে থাকা আঁধারই হল আদতে সবচেয়ে ভয়ংকর — পো থেকে শুরু করে ম্যাথেসন, ব্লক থেকে ব্যোমোঁ— বিশ্বের তাবড় হরর লেখকরা তাঁদের লেখায় এটাই বারবার প্রমাণ করেছেন। মনের আঁধার যখন চোরাবালি হয়ে কাউকে গ্রাস করে, তখন সেই হতভাগ্য মানসিক ভারসাম্যহীনতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়, হয়ে ওঠে নিজেই নিজের শত্রু— জনি ডেপ অভিনীত ‘সিক্রেট উইন্ডো’ সিনেমার মতো এই ‘প্রেতিনী’ গল্পটাও এই চরম সত্যিকেই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

কৌশিক মজুমদার কল্পবিজ্ঞান খুব বেশি লেখেননি, এটা তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি। ‘বারো মিনিট’ পড়ার পর যদি আপনাদের মনে হয় বাংলা কল্পবিজ্ঞানকে তাঁর আরও অনেক কিছু দেওয়ার রয়েছে, আমি অন্তত অবাক হব না। এলিয়েন ইনভেশন-এর চেনা ট্রোপ-কে নতুনভাবে ব্যবহার করে চমৎকার এক গল্প ফেঁদেছেন লেখক, যা আইজ্যাক আসিমভ-এর ‘ডাজ আ বি কেয়ার?’-এর মতোই রোমাঞ্চকর ও স্বাদু। শেষ লাইনের অপ্রত্যাশিত ট্যুইস্ট এই কাহিনির উপরি পাওনা, সায়েন্স ফিকশনের অভিধান থেকে বিদায় নিতে চলা ‘সেন্স অফ ওয়ান্ডার’-এর রেশ ফিরিয়ে আনে এক লহমায়।

রোয়াল ডাল-এর ‘ল্যাম্ব টু দ্য স্লটার’ এক অনবদ্য গল্প, যা সাদা পাতায় ছাপা কালো অক্ষরে তো বটেই, ‘অ্যালফ্রেড হিচকক প্রেজেন্টস’ টেলিভিশন সিরিজের সাদা কালো এপিসোডেও বাজিমাত করেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ক্রাইম ফিকশনের উৎসাহী পাঠকদের বিনোদনের রসদ জুগিয়ে চলা এমন এক কাহিনি বাংলায় অনুবাদ করা বড়ো সহজ কাজ নয়। অতএব খোলা মনে আসুন, পাঠক, সাক্ষী হন মেরি ম্যালোরি-র অপূর্ব রন্ধনশিল্পের, এবং জেনে নিন কীভাবে প্যাট্রিক ম্যালোরি-র খুনের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল এক আশ্চর্য জিনিস (হিচকক-এর ভাষায় ‘ম্যাকগাফিন’)...

২০১৭ সালের মার্চ মাসে প্রকাশ পাওয়া ‘কিশোর ভারতী’ বিশেষ অনুবাদ সংখ্যা বিশ্বসাহিত্যের মণিমুক্তোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছিল। ‘সে এক অদ্ভুত পার্টি’ ছিল সেই সংখ্যার অন্যতম উজ্জ্বল এক রত্ন। মূল গল্প ‘হাউ টু টক টু গার্লস অ্যাট পার্টিজ’, লেখকের নাম নিল গেইম্যান। সায়েন্স ফ্যান্টাসির অদ্ভুত মায়াময় আবেদন, বুকের বাঁদিক ছুঁয়ে যাওয়া ভাষা, ম্যাজিশয়ান গেইম্যান-এর ‘এক্সক্লুসিভ’ কাব্যিক ন্যুয়ান্স— সব মিলিয়ে এই কাহিনি অনায়াসে স্থান করে নিয়েছিল আমাদের মনের মণিকোঠায়, ট্রায়োলেট-এর অদ্ভুত কবিতার মতোই। আর এখন, পাঠক, গেইম্যান-এর অনন্যসাধারণ এই গল্পের স্বাদ গ্রহণের বিরল সুযোগ পেতে চলেছেন আপনারাও।

লরেন্স ব্লক-এর ‘ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ’-এর অনুবাদ ‘পাকড়ো-ছোড়ো’ কাহিনির ভয় বাস্তব জগতে ঘোরাফেরা করে, কখনও খবরের কাগজের শিরোনাম, কখনও টিভি মিডিয়ার ব্রেকিং নিউজ হয়ে। যে বিপদের আশঙ্কা করে অচেনা মানুষকে ঘরে ঢোকাতে ইতস্তত করি আমরা, ছোটোদের সাবধান করে দিই অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা না বলতে, শুনশান রাস্তায় কোনও গাড়িতে লিফট নেওয়ার আগে দুবার ভাবি, সেই বিপদের উৎস ভূত, প্রেত বা পিশাচ নয়, মানুষ স্বয়ং। জীবন কেড়ে নেওয়াটা তাদের কাছে নিছকই খেলা। এই খেলার নিয়ম তারা নিজেরাই বানায়... এবং নিজেরাই ভাঙে। এবং হয়তো এই মুহূর্তে তারাও, আপনারই মতো, এই বইটা পড়ছে...

এই সংকলনের শেষ গল্প, জে এ কনর‍্যাথ রচিত 'পানিশমেন্ট রুম'-এর অনুবাদ 'সাজাঘর' এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ডিসটোপিয়া, যেখানে স্বৈরাচারী শাসকের দমনপীড়ন সে দেশের নাগরিক নয়, নেমে আসে তাদের স্কুলপড়ুয়া সন্তানদের ওপর। হ্যাঁ, ঠিকই শুনলেন, সেই দুনিয়ায় ডিসিপ্লিন ভঙ্গের মতো সামান্য অপরাধের শাস্তি হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্মম অত্যাচারকে বৈধতা দিয়েছে রাষ্ট্রশক্তি, এবং শাস্তিপ্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে একদল ধর্ষকামী, নৃশংস জল্লাদের ওপর। গল্পটা আপনার চোখ থেকে সুখী মধ্যবিত্ত দিনযাপনের রঙিন চশমা চিরতরে খসিয়ে দেবে। দেবেই।

'স্টোরিজ' সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদক নিল গেইম্যান বলেছিলেন, 'The joy of fiction, for some of us, is the joy of the imagination, set free from the world and able to imagine.' আজ অবধি পৃথিবীতে যত কাহিনি রচিত হয়েছে তাদের মূল উদ্দেশ্য একটাই— কল্পনার আশ্রয় নিয়ে যুগ যুগ ধরে আমাদের মনে উদয় হওয়া একটাই মাত্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর জোগানো। কী সেই প্রশ্ন? 'তারপর কী হল?' ছেলেবেলায় অন্ধকার ঘরে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে বাচ্চারা এই প্রশ্ন তাদের দাদু দিদিমাকে করে, রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার উপন্যাসের পাতা উলটোতে উলটোতে এই প্রশ্ন পাঠকের মনের অন্দরে ঘুরপাক খায়, এবং কাগজ কলম নিয়ে ধ্যানে বসা মননশীল লেখককে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কৌশিক মজুমদারও তার ব্যতিক্রম নন।

তাই নিশ্চিন্ত মনে 'আঁধার আখ্যান' হাতে তুলে নিন, পাঠক, পনেরোটি আঁধারঘেরা কাহিনির হাতছানিতে ধরা দিন স্বেচ্ছায়। দেখবেন, এক নতুন জগতের সন্ধান পাবেন আপনি, যে জগতে আলো খেলে না, চাঁদ ওঠে না, তারা ফোটে না, যেখানে কেবল আঁধারের বাস। আপনার মনে হবে এক নিকষ কালো সমুদ্র চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে আপনাকে, অথবা আপনার চোখের সামনে কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ। আপনি বারবার প্রশ্ন করবেন, 'তারপর কী হল?', উত্তরও পাবেন, কিন্তু সেই উত্তর আপনাকে পরিতৃপ্তি দেবে না, বরং দাঁড় করাবে অন্য আর-একটা প্রশ্নের সামনে, তারপর আর-একটা, তারপর আর-একটা... কখনোই সম্পূর্ণ হবে না আখ্যানের এই বৃত্ত; প্রতিমুহূর্তে ভাঙবে, গড়বে, এবং আপনার পরিচয় করাবে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের সঙ্গে।

আজ এইটুকুই। আপনাদের আঁধার অন্বেষণ শুভ হোক!

সৌভিক চক্রবর্তী
সেইল-আইএসপি, বার্নপুর
২৭শে অক্টোবর, ২০২০

লেখক পরিচিতি

কৌশিক মজুমদারের জন্ম ১০ এপ্রিল, ১৯৮১, কলকাতা। স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পি. এইচ. ডি. তে সেরা ছাত্রের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। নতুন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া Bacillus sp. KM5 এর আবিষ্কারক। ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়ায় বৈজ্ঞানিক পদে কর্মরত। জার্মানী থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা গবেষণাগ্রন্থ Discovering Friendly Bacteria : A Quest (২০১২)। তাঁর কমিকস ইতিবৃত্ত (২০১৫), হোমসনামা (২০১৮), মগজাস্ত্র (২০১৮), জেমস বন্ড জমজমাট (২০১৯), তোপসের নোটবুক (২০১৯), কুড়িয়ে বাড়িয়ে (২০১৯), নোলা (২০২০) ও সূর্যতামসী (২০২০) সুধীজনের প্রশংসাধন্য। *সম্পাদিত গ্রন্থ সিদ্ধার্থ ঘোষ প্রবন্ধ সংগ্রহ (২০১৭, ২০১৮) ফুড কাহিনি (২০১৯) ও কলকাতার রাত্রি রহস্য (২০২০)।*